নাগরিক উদ্যোগ

একটি মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশনা

দশম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা
জানুয়ারি-জুন ২০১১

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান
ড. মিজানুর রহমান- এর সাক্ষাৎকার

তথ্য অধিকার ও দুর্নীতি দমন

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও
বর্তমান পরিস্থিতি

'বর্ণ' ও 'দলিত' প্রেক্ষিত
বাংলাদেশ

গৃহ শ্রমিকের জন্য আইনি সুরক্ষা

সংবিধান সংশোধন প্রাসঙ্গিক ভাবনা ও নাগরিক উদ্বেগ

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG

প্রতিনিয়ত আমরা কোনো না কোনোভাবে পুলিশের মুখোমুখি হই। আমরা পুলিশকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে দেখি যেমন– যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ভিআইপিদের নিরাপত্তা, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ, জনগণকে নিরাপত্তা দিয়ে আদালতে নেয়া, আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, থানায় অভিযোগ দায়ের বা অপরাধী ও জঙ্গিদের পাকড়াও ইত্যাদি। আমরা পুলিশ সম্পর্কে পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন ও জনসাধারণের কাছ থেকে প্রচুর অভিযোগ শুনতে পাই। প্রত্যেকেরই পুলিশ সম্পর্কে একটা মতামত থাকে। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ মানুষই তাদের সম্পর্কে খুব কম জানে।

এ পুস্তিকাটি পুলিশকে জানার একটি সহজ নির্দেশিকা। সাধারণত যখন আমরা কোনো বিষয়ে জানি তখন তা বলিষ্ঠভাবে বলতে পারি এবং যখনই আমরা নির্ভয়ে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলি তখন তার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। পুস্তিকাটি এই প্রত্যাশায় প্রকাশ করা হলো যে, পুলিশ ও জনগণের অধিকার সম্পর্কে জেনে প্রত্যাশিত উন্নত পুলিশি সেবার লক্ষ্যে তাদের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাবে।

অনুবাদ ও প্রাসঙ্গিকীকরণ : অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম ও মাজহারুল ইসলাম

পর্যালোচনা : সারা হোসেন ও জাকির হোসেন

অঙ্কন : রাজীব বাঙাল ও সৌরি ছোঁয়া

প্রকাশক : নাগরিক উদ্যোগ, ব্লাস্ট ও কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ

দাম : ১০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-1980-7

সূচিপত্র

সংবিধান সংশোধন : প্রাসঙ্গিক ভাবনা ও নাগরিক উদ্বেগ ৩

আবারও সংবিধান সংশোধন হলো। এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আলাপ-আলোচনা চলছে দীর্ঘ সময় ধরে। যদিও সংবিধান সংশোধন নতুন কোনো বিষয় নয়। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। যদিও কতটি সংশোধনী জনগণ বা নাগরিকবান্ধব– এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন আছে। সংবিধানের বর্তমান সংশোধন প্রক্রিয়ার ফলাফল, নাগরিক প্রত্যাশা এবং পঞ্চম সংশোধনী মামলার আপিল বিভাগের রায় প্রকাশ নিয়ে লিখেছেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ ***ড. শাহদীন মালিক***।

তথ্য অধিকার ও দুর্নীতি দমন ৮

তথ্য অধিকার হলো মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। পৃথিবীর প্রায় ৮৮টি দেশ 'তথ্য অধিকার'কে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের দেশেও 'তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯' জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে প্রায় দুই বছর হয়ে গেল। যদিও জনগণ এ সম্পর্কে এখনো তেমন ওয়াকিবহাল নয়। তথাপি এ আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে দুর্নীতি প্রতিরোধ, দায়িত্বশীল সরকার ও প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। তাই নিয়ে লিখেছেন তথ্য কমিশনার ***ড. সাদেকা হালিম***।

সরকার ও মানবাধিকার কমিশন পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয় ১০

অধ্যাপক ***ড. মিজানুর রহমান*** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান। বর্তমানে তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নাগরিক উদ্যোগের সাথে তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন।

আরো যা আছে

'বর্ণ' ও 'দলিত' : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ০৬
- মো: মহান উল হক এবং ড. মোহাম্মদ শাহাজালাল
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও বর্তমান পরিস্থিতি ১৩
- চিররঞ্জন সরকার
বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার একটি বিশে-ষণ ১৬
গৃহ শ্রমিকের জন্য আইনি সুরক্ষা– আর কত অপেক্ষা? ২০
- সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ ও নাজমা ইয়াসমীন
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, সামাজিক নিরাপত্তা ও জাতীয় বাজেট ২২
- মনোয়ার মোস্তফা
সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন : প্রেক্ষিত আড়িয়ল বিল ২৫
- এম এম কবীর মামুন
পোশাক শিল্পে নারীর যুক্ততা মতাদর্শিক নির্মাণ ২৭
- রাবেয়া খাতুন
বই পর্যালোচনা 'বৃত্ত ও বৃত্তান্ত' ২৯
- সোমা দত্ত
রক্ষাগোলা স্বনির্ভর খাদ্য নিরাপত্তা একটি বিকল্প ধারণা ৩১
- সারওয়ার-ই-কামাল স্বপন

নাগরিক উদ্যোগ
একটি মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশনা

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
সোমা দত্ত

সম্পাদকমণ্ডলী
বৃত্বা রায়
অমিত রঞ্জন দে
মাহাবুবা সুলতানা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মিঠু আহমেদ

আলোকচিত্র
নাগরিক উদ্যোগ, মিঠু আহমেদ ও ইন্টারনেট

প্রকাশক
নাগরিক উদ্যোগ
বাড়ি : ৮/১৪, ব-ক : বি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১১৫৮৬৮
ফ্যাক্স : ৯১৪১৫১১
ইমেইল : nu@bdmail.net
ওয়েবসাইট : www.nuhr.org

মুদ্রণ
চৌধুরী প্রিন্টার্স অ্যান্ড সাপ-াই
৪৮/এ/১ বাড্ডানগর লেন
পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

দাম : ১৫ টাকা

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

নির্যাতক-নীপিড়কদের কঠোর শাস্তি প্রদান করুন

আর কেউ যেন এমন ঔদ্ধতপূর্ণ আচরণের সাহস না পায়

সম্প্রতি 'নারীর প্রতি সহিসংতা'র বেশকিছু চিত্র দেশব্যাপী বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। এসব ঘটনা নজর কেড়েছে বুদ্ধিদীপ্ত বিবেকবান সচেতন মানুষ, নীতিনির্ধারক এবং গণমাধ্যমের। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে আমরা দেখি ঘটনাগুলোর চিত্র এ রকম– স্বামীর অত্যাচারে শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার নার্সিস আক্তারের মৃত্যু, যৌতুকের জন্য গায়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার হালিমাকে হত্যা, স্বামীর নির্যাতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুমানা মঞ্জুরের দৃষ্টি হারানো, বখাটেদের উৎপাতে পাবনা সদর উপজেলার শামীমা আক্তারের আত্মহত্যা, ঢাকার নামকরা বিদ্যাপীঠ ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী নির্যাতন, অসামাজিক কাজে জড়িত থাকার অপবাদে বগুড়ার আদমদীঘিতে ফতোয়া দিয়ে গৃহবধূ লাভলি বেগমের মাথা ন্যাড়া করে দেয়া, বিয়ানীবাজারে ধর্ষণের শিকার এক অন্তঃসত্ত্বা কিশোরীকে গ্রাম্য সালিশে প্রহার, রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নের কাশীগঞ্জ গ্রামে দুই গৃহবধূ হাফিজা বেগম হ্যাপী এবং সাইদা বেগমকে সালিশে অমানুষিক নির্যাতন করা ইত্যাদি। এসবই গত মাস তিনেকের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত নারীর প্রতি সহিংসতার কেবল গুটিকয়েক নমুনা। নিপীড়িত নারীরা বিভিন্ন বয়স, স্থান-কাল-পাত্রের। অথচ সমাজে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিকতার রুদ্র-রুক্ষ-কটাক্ষতার শিকার তারা সকলেই। নারীর শিক্ষা, পদমর্যাদা, অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থান কোনো কিছুই থামাতে পারছে না– এই নির্মমতা।

তাই সময় এসেছে অধিকার–মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আরো বিশেষ সক্রিয় তৎপরতার। তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করার। আমরা চাই, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে যেসব আইন রয়েছে সেগুলোর যথাযথ বাস্তাবায়ন হোক। ২০০৯ সালের ১৪ মে বাংলাদেশ হাইকোর্ট এর প্রতিরোধে এক যুগান্তকারী রায় দেন। এতে বলা হয়, যৌন হয়রানি বিষয়ে আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। সেই সঙ্গে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এ নির্দেশনার আলোকে যৌন হয়রানি নিরোধ আচরণবিধি এবং সেল সৃষ্টি করতে হবে। আজ সময় এসেছে যৌন হয়রানি রোধে সেই নির্দেশনার আলোকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা গ্রহণ করার। আমরা ইতোমধ্যে সরকারের তরফ থেকে এসব ঘটনার প্রতিকার এবং প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করেছি। আমাদের দাবি– এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচারের মাধ্যমে নির্যাতক-নীপিড়কদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা। যাতে আর কখনো কোনোদিন কেউ এমন ঔদ্ধতপূর্ণ আচরণের সাহস না পায়। তবে শুধু শাস্তি প্রদানই একমাত্র সমাধান নয়। এর পেছনে যে মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক কাঠামো ক্রিয়াশীল তার মূল চিহ্নিত করা এবং সমাধানের উপায় নির্ধারণে নিবিড় অনুসন্ধান প্রয়োজন। বিভিন্ন মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

সংবিধান সংশোধন প্রাসঙ্গিক ভাবনা ও নাগরিক উদ্বেগ

এ প্রবন্ধটি গত ১০ এপ্রিল ২০১১– এ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'সুজন' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত হয়। বর্তমানে সংবিধান সংশোধনী পাস হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত বক্তব্যের যৌক্তিকতা এখনো বিদ্যমান। তাই পাঠকদের জন্য প্রবন্ধটি পুনরায় প্রকাশ করা হলো।

ড. শাহদীন মালিক*

অচিরেই আমাদের সংবিধান সংশোধিত হতে যাচ্ছে। এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা, আন্দোলন চলছে ছয় মাসের অধিককাল ধরে। সংবিধান সংশোধন নিয়ে জোরেশোরে আলাপ-আলোচনার সূত্রপাতের কারণ দুটো– জুলাই ২০১০- এ পঞ্চম সংশোধনী মামলার আপীল বিভাগের রায় প্রকাশ এবং এই সংশোধনীর জন্য বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন।

এ পর্যন্ত গত কয়েক মাসে সংবিধান সংশোধন নিয়ে যে ধরনের আলাপ-আলোচনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রায় সব কয়টিই জনগণ বা নাগরিকবান্ধব নয়। ফলে আমরা উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন।

আমাদের উৎকণ্ঠার যথার্থতা আর উদ্বেগের কারণ তিনটি– (১) এ পর্যন্ত যে আলাপ-আলোচনা ও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার যথার্থতা নিয়ে, (২) যে পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধনী প্রক্রিয়া এগিয়েছে তার বাস্তবতা নিয়ে এবং (৩) যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে।

অতীত সংশোধনী

এটা সর্বজনবিদিত যে, এ পর্যন্ত আমাদের সংবিধানের চৌদ্দটি সংশোধনী হয়েছে। এই চৌদ্দটি সংশোধনীর অধিকাংশ, এমনকি প্রায় সব কয়টি হয়েছে রাজনৈতিক এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক ক্ষমতার স্বার্থ থেকে। জনগণের

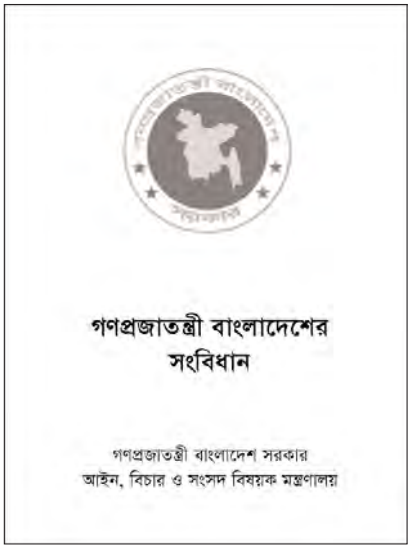

স্বার্থে সংশোধনীর সংখ্যা নগণ্য অর্থাৎ আমাদের সংবিধান সংশোধনের ইতিহাস মোটেও সুখকর নয়।

বলে রাখা দরকার, আমাদের ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধান সত্যিকার অর্থেই একটা মুক্তির দলিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ ছিল না। স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে স্বাধীন দেশে 'জনগণের জন্য সাম্য মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে (স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ভাষায়) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল এবং সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল আমাদের সংবিধানে।

১৯৭১– এ মুক্তিযুদ্ধের সময় যে মুক্তির স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম এবং যে মুক্তির জন্য আমাদের জীবন, মান ও সম্পদের যে বিরাট ও ভয়াবহ মূল্য দিতে হয়েছিল সেই মুক্তির স্বপ্ন ও আদর্শের দলিল ছিল আমাদের সংবিধান।

এরপর গত প্রায় চলি-শ বছরের সংবিধান সংশোধনীর যে ইতিহাস সেটা এক কথায়, মুক্তির সেই স্বপ্ন ও আদর্শের বিচ্যুতির ইতিহাস।

সংক্ষেপে গুটিকয়েক উদাহরণ টানা দরকার। সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিবর্তনমূলক আটকাদেশ (preventive detention)- এর সুযোগ ছিল না। অর্থাৎ কোনো অপরাধ করার আগেই অপরাধ করতে পারে এই আশংকা থেকে কোনো নাগরিককে আটকের বিধান ছিল না। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে নিবর্তনমূলক আটকাদেশের বৈধতা দেয়া হলো এবং এই সংশোধনীর পর বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ প্রণীত হলো। এই বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় গত পঁয়ত্রিশ বছরে অন্তত দশ লাখ নাগরিককে বিভিন্ন মেয়াদের জন্য আটক রাখা হয়েছিল; যদিও তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না। আশির দশকের শুরু থেকে সুপ্রিম কোর্টের গত প্রায় বিশ বছরে এই নিবর্তনমূলক আটককে ক্রমগতভাবে অবৈধ ঘোষণা করে। বর্তমানে নিবর্তনমূলক আটকাদেশের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত করতে পেরেছে।

জরুরি অবস্থার আইনগত অর্থ হলো জরুরি অবস্থা বিদ্যমান থাকাকালে নাগরিকদের কিছু সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করতে পারা এবং কিছু মৌলিক অধিকার বলবৎ বা বাস্তবায়নের জন্য আদালতকে নির্দেশ দিতে বিরত রাখা। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে জারিকৃত জরুরি অবস্থার ব্যাখ্যা দিতে হাইকোর্টের একটি রায়ে নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক অধিকার সীমিত করার ব্যাখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু আপিল বিভাগের ব্যাখ্যা জরুরি অবস্থায় সব মৌলিক অধিকার অকার্যকর থাকতে পারে। অর্থাৎ হাত নিচে দিয়ে পা উপরে করে হাটা বাধ্যতামূলক করেও সংসদ বা অধ্যাদেশের বলে বিধান জারি করা যায়! সংবিধানে নবম 'ক' ভাগে 'জরুরি অবস্থা' শীর্ষক একটা ভাগ আছে যা প্রায় দুই পৃষ্ঠা দীর্ঘ।

১৯৭২- এর সংবিধানে 'জরুরি অবস্থা' শব্দ দুটো আমি এখনো বুঝতে পারিনি। অর্থাৎ

* জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ

মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা যাবে এমন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৭২- এর অনুচ্ছেদ ৬৩(৩)- তে ছোট একটা ব্যতি□মী বিধান ছিল– যুদ্ধ কিংবা আ□মণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কালে সংসদ কিছু বিশেষ আইন পাস করতে পারবে।

সংবিধান দ্বিতীয় সংশোধীতে এই উপঅনুচ্ছেদ ৬৩(৩) বাদ দিয়ে যোগ হলো দুই পৃষ্ঠাব্যাপী নতুন ভাগ আর সুপ্রিম কোর্ট আরো এক ধাপ এগিয়ে জরুরি অবস্থায় সব কিছুই করা যাবে বলে ব্যাখ্যা দিলেন।

অর্থাৎ সাময়িকভাবে হলেও সংবিধানে জরুরি অবস্থা চলাকালীন মৌলিক অধিকার গায়েব হয়ে যেতে পারে, যেমনটি হয়েছিল ১৯৭৫ এবং ১৯৮২- তে।

চতুর্থ সংশোধনীর একটা দিক অর্থাৎ এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা সব সময়ে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। আমার দৃষ্টিতে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চতুর্থ সংশোধনীর অপেক্ষাকৃত কম জনবিরোধী অংশ। চতুর্থ সংশোধনীর আরো জনবিরোধী অংশের অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। একটাতেই সীমাবদ্ধ থাকবো।

সংবিধানের রিট ক্ষমতা অর্থাৎ ১০২ অনুচ্ছেদের দুটি অংশ। প্রথমটা হলো কোনো মৌলিক অধিকার লংঘন হলে তার বিরুদ্ধে রিট মামলা হয়। আর দ্বিতীয়টা হলো কোনো কর্তৃপক্ষ যদি কোনো বেআইনি বা ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ করে। সেটার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট মামলা করা। সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে যে সুপ্রিম কোর্টের রিট ক্ষমতা সেটা চতুর্থ সংশোধনীতে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীর অবৈধ ক্ষমতা দখল বৈধকরণ প্রয়াস ও তার পরিণতির কথাও আমরা জানি।

তথাকথিত ভালো সংশোধনীর পরিণামও আমরা দেরিতে হলেও এখন হাড়ে হাড়ের টের পাচ্ছি। ত্রয়োদশ সংশোধনীর কারণে আমরা ঘোষণা দিয়েছি যে, এ দেশে সব সময় নির্বাচিত সরকার না থাকলেও চলবে, এদেশে কিছু সময় নির্বাচিত আর কিছু সময়ে অনির্বাচিত সরকার থাকবে। মাথা ব্যথা সারাতে মাথা কেটে ফেলেছি। মাথাই যদি না থাকে তাহলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কাজ করবে না সেটা বুঝতে আমাদের এক যুগ লেগে গেছে। অনেকের অভিযোগ করেন, সুপ্রিম কোর্ট এখন পার্টি অফিস হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী সাংসদদের মতো বিচাপতিরাও তাদের সম্পত্তির হিসাব আর দেন না বা দিতে অপারগতা প্রকাশের যুক্তি খুঁজে পান।

খুব সাদামাটা সংশোধনীর পরিণতি যে কত বীভৎস হতে পারে তা আমরা দেখেছি চতুর্দশ সংশোধনীতে। বিচারপতিদের অবসরের বয়স ৬৫ বছরের পরিবর্তে ৬৭ বছর লেখার কারণেই ওয়ান-ইলেভেন হয়েছিল। ৬৫ বছরের জায়গায় ৬৭ বছর করার পরিণতিটা কি ভয়াল তা রাজনীতিবিদরাই সবচেয়ে বেশি টের পেয়েছেন বলে আমার ধারণা।

অর্থাৎ চার দশক ধরে আমরা সংবিধান সংশোধন করেছি যাতে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বপ্ন আর আদর্শ থেকে যত দূরে যেতে পারি তার জন্যই। কোনো সংশোধনীতেই মুক্তিযুদ্ধের সেই 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার'- এর লেশমাত্র খুঁজে পাই না। এসব নাগরিক-স্বার্থ বিরোধী সংশোধনীর ফলোশ্রুতিতে আমরা পাই র‍্যাব সদস্যদের মানবাধিকার রক্ষা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আহাজারি।

চার দশক ধরে আমরা সংবিধান সংশোধন করেছি যাতে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বপ্ন আর আদর্শ থেকে যত দূরে যেতে পারি তার জন্যই। কোনো সংশোধনীতেই মুক্তিযুদ্ধের সেই 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার'- এর লেশমাত্র খুঁজে পাই না। এসব নাগরিক-স্বার্থ বিরোধী সংশোধনীর ফলোশ্রুতিতে আমরা পাই র‍্যাব সদস্যদের মানবাধিকার রক্ষা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আহাজারী।

পুনঃমুদ্রণ ও বিভ্রান্তি

প্রধান বিচারপতি সংবাদ সম্মেলনে সংবিধান পুনঃমুদ্রণের কথা বললেন। আর তাতেই সারা দেশ হৈ হৈ রৈ রৈ শুরু হয়ে গেল।

কেউ একবার ভেবেও দেখলেন না যে বিচারকরা তাদের প্রদত্ত রায়ের বাইরে যা কিছু বলুন না কেন, তার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। আইনমন্ত্রীও রায় দিলেন পুনঃমুদ্রণ হবে।

সুপ্রিম কোর্ট (সংবিধান সংশোধনীও একটা আইন) অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট যখন কোনো আইনকে বাতিল বা অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন, তার সার্বিক অর্থ হলো, বাতিলকৃত আইন বা ধারাটা আদালত দ্বারা বলবৎ যোগ্য নয়। আইনে ধারাটা থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সংসদ সেটাকে আইন থেকে বাদ না দেবে।

আইন থেকে বাতিলকৃত ধারাটা বিলুপ্ত করার আদেশ সংসদকে সুপ্রিম কোর্ট দিতে পারে না। আর সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ বা অসাংবিধানিক ঘোষিত আইনের ধারা বা সংবিধানের অনুচ্ছেদের পরিবর্তে সেখানে কি আসবে বা আদৌ কিছু আসবে কি না সেটা সম্পূর্ণ এবং একমাত্র সংসদের একচ্ছত্র এখতিয়ার।

আমি যতদূর জানি, সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদ এখনো বহাল আছে যেখানে বলা আছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী এবং বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টকে সহায়তা করবেন। সংসদ- এর কথা বলা নাই অর্থাৎ সংসদ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য নয়। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে বলা আছে, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। ১২৬- এ আদালতকে যে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করতে হবে সে কথা বলা নেই। কোনো অর্বাচীন নির্বাচন কমিশন মনেই করতে পারে, নির্বাচন জাতির জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা আদলতেরও কর্তব্য এবং আদালত সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সব মামলার রায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে দেবেন, তাহলে কি আমাদের গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে?

অষ্টম সংশোধনী মামলার ফলোশ্রুতিতে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত ১০০ অনুচ্ছেদ অসাংবিধানিক ঘোষিত হয় এবং আদালত পুরনো বা আদি ১০০ অনুচ্ছেদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদেশ দেন (Stands Restorted)। বলা হয়ে থাকে, বিএনপি সরকার নির্বাচিত হওয়ার

পর ১৯৯১ সালের জুন মাসে ছাপানো সংবিধানে পুরনো ১০০ অনুচ্ছেদ পুনঃমুদ্রিত হয়।

তথ্যটা ভুল। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান থাকাকালীন ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে যে সংবিধান মুদ্রিত হয় সেই সংবিধানে প্রথম পুরনো ১০০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়।

১৯৯০- এর ডিসেম্বরে সংসদ ছিল না। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অষ্টম সংশোধনী মামলার রায় প্রদানকারী একজন বিচারপতি ছিলেন। পরে নির্বাহী বিভাগের প্রধান হয়ে তার আমলে এই ১০০ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপিত হয়।

পুনঃমুদ্রিত সংবিধানটি গায়েব হয়ে গেছে। ৫০০ কপি ছাপা হয়েছে। কিন্তু এটা এখন সর্বোচ্চ গোপনীয় দলিল হয়ে গেছে। অতএব দেরিতে হলেও সরকার ভুল বুঝতে পেরেছে বলে আমি ধরে নিচ্ছি।

যেটা মুদ্রিত হয়েছে সেটাকে সংবিধান মনে করার কোনো আইন সঙ্গত কারণ নেই। অসংখ্য ভুলে ভরা। আমি যে অনুচ্ছেদ নিয়ে কাজ করি অর্থাৎ রিট সংক্রান্ত ১০২ অনুচ্ছেদেই প্রচুর ভুল আছে। এসব ভুল নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। তাই পুনরাবৃত্তি নিরর্থক।

সংবিধান নিয়ে এ ধরনের বালখিল্যতা করার জন্য পৃথিবীর যে কোনো ন্যূনতম সভ্য দেশের আইনমন্ত্রী বহু আগেই পদত্যাগ করতেন।

আমাদের এই দেশে যারা একবার কোনো গদিতে বসেন তাদের প্রায় সবার কাছ থেকে ভদ্রতা, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ইত্যাদির প্রত্যাশা আমরা নাগরিকরা বহু আগ থেকেই ছেড়ে দিয়েছি। দেশ জাহান্নামে যাক, গদি ধরে রাখাই আসল নীতি ও আদর্শ।

সংবিধান সংশোধন

এখন তো প্রায় প্রতিদিনই কোনো কোনো নতুন সংশোধনের প্রস্তাব বাজারে আসছে।

টেলিভিশনের ক্যামেরা আর মাইক সামনে পেলেই আমরা সংবিধানের নতুন নতুন সংশোধনের কথা হুট করে বলে ফেলি। এই হুটোহুটির ধাক্কায় সংবিধান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল।

আগেই বলেছি, আমদের প্রায় সব কয়টি সংশোধনই হয়েছে জনগণের অধিকার হ্রাস বা খর্ব করার জন্য অথবা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ ও ক্ষমতা দখল বৈধ করতে বা ক্ষমতায় থাকার ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করতে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার বানের জলে ভেসে গেছে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব আমাদের উদ্বিগ্ন করছে। এমনিতেই পুনঃমুদ্রণের জট খোলা সহজ হবে না। তদুপরি নতুন নতুন সংশোধনীর ধারণা জটিলতা আরো বাড়াবে। পদ্ধতিগতভাবে আমরা নাগরিকরা সংশোধনীর প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত নই। কখন কীভাবে কী প্রক্রিয়ায় আমাদের অবগত করা হবে সেটাও অজানা। বিশেষ সংসদীয় কমিটি তাদের কাজ শেষে মতামতের জন্য কোনো খসড়া জনসমক্ষে পেশ করবে কি না সেটাও অজ্ঞাত।

সংবিধান কোনো বিশেষ দল বা মহলের ক্ষমতায় টিকে থাকার দলিল নয়। এটা জনগণের ক্ষমতার মালিকানার দলিল। তাই আমরা চাই অংশীদারিত্বমূলক স্বচ্ছ প্রক্রিয়া। সংশোধন যত কম করা যায় ততই মঙ্গল এবং যতটা সম্ভব, যদি সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নাও হয়, ততটা ১৯৭২– এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া।

একই সাথে দেশের প্রধান বিরোধী দলের এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা, নিছক সমালোচনা করার স্বার্থে সমালোচনা করা ছাড়া কোনো গঠনমূলক সংশোধনী প্রস্তাব না দেয়া, সেনাবাহিনী কর্তৃক সংবিধান বহির্ভূতভাবে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে শক্ত ও নীতিগত অবস্থান না নেয়া– এসবও আমাদের উদ্বিগ্ন করছে।

গত চলি-শ বছরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার থেকে যে বিচ্যুতি ঘটেছে তার সংশোধনের একমাত্র উপায় হলো ১৯৭২- এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া। ছোট জাতিগোষ্ঠী এবং ৭০ অনুচ্ছেদের কিছু পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তাবনা নাগরিকদের বিবেচনা ও মতামতের জন্য উন্মুক্ত করা অত্যাবশ্যক। বিচার বিভাগের স্বার্থেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা রাখতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।

মোদ্দা কথা, সংবিধান কোনো বিশেষ দল বা মহলের ক্ষমতায় টিকে থাকার দলিল নয়। এটা জনগণের ক্ষমতার মালিকানার দলিল। তাই আমরা চাই অংশীদারিত্বমূলক স্বচ্ছ প্রক্রিয়া। সংশোধন যত কম করা যায় ততই মঙ্গল এবং যতটা সম্ভব, যদি সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নাও হয়, ততটা ১৯৭২- এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া। ■

‘বর্ণ’ ও ‘দলিত’ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ মহান উল হক*
ড. মোহাম্মদ শাহাজালাল**

‘দলিত’ সম্প্রদায় জন্ম ও পেশার কারণে সামাজিকভাবে বঞ্চিত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে তৃতীয় অনুচ্ছেদের ২৯(১) ও (২) নং ধারা অনুযায়ী জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও তারা বৈষম্যের শিকার এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার বাস্তবতায় বাস করছে। সামাজিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে, রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি সুযোগ, সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত যার মূল কারণ, তাদের জন্ম ও পেশাগত পরিচিতি। এক্ষেত্রে বঞ্চনার সাথে সাথে মানবাধিকার থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি সবচেয়ে কেন্দ্রীয় বাস্তবতা যা মার্কসের (১৯৫১)- এর ‘বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব’র আলোকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ‘দলিত’- এর পরিচিতি বঞ্চিতদের সামগ্রিক পরিচিতি যা শুধু কোনো নির্দিষ্ট বর্ণ বা জাত - এর পরিচিতি নয় এবং এর বঞ্চনার পরিসরকে বোঝা যায় বর্ণ ও জাত ব্যবস্থার সাপেক্ষে জন্ম ও পেশার ভিত্তিতে তাদের ‘অস্পৃশ্যতার’ প্রবল পরিসরটা বোঝার মধ্য দিয়ে। এর সাথে আবার যুক্ত সামাজিক আধিপত্যশীল মতাদর্শের ‘শুচি’ ও ‘অশুচি’র ধারণার নির্মাণ যা অস্পৃশ্যতার কার্যক্রমকে সামাজিকভাবে বৈধতা দেয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ‘দলিত’কে বুঝতে হলে বর্ণ ও জাত ব্যবস্থার সাপেক্ষে ঐতিহাসিকভাবে তাদের পথ পরিক্রমা বোঝা প্রয়োজন। ‘Caste’ শব্দটি পর্তুগিজ ‘Casta’ শব্দ থেকে এসেছে। উপমহাদেশে এর প্রচলন ভারতবর্ষেই অধিক।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি পর্তুগিজরা ভারতীয়দের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে জাতি শব্দটি ব্যবহার করেন। আর আর্যরা এই অঞ্চলে আসবার পর আর্য ও অনার্যের মধ্যকার বিভাজনকে বুঝতে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। Gupta Diponkor (১৯৮০) তাঁর ‘From Varna to Jati’ বইতে Caste System সম্পর্কে বলেন যে, উপমহাদেশে জাতি ও বর্ণ- এর সমন্বিত রূপ হিসেবে জাতি ব্যবস্থা প্রকাশিত হয়। বর্ণ দ্বারা যে ধরনের শ্রেণী বর্গায়নকে বোঝানো হয় তার সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছেন অস্পৃশ্যরা অথবা ‘দলিত’রা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, জাতি ব্যবস্থায় কোনো জাতির অবস্থান জন্মসূত্রেই নির্ধারিত হয় যা তার কর্মকে নির্দেশ করে, যা প্রায়ই অপরিবর্তনীয়। অন্যত্র এই ব্যবস্থায় জাতি, বর্ণসমূহ বংশানুক্রমিকভাবেই অপরিবর্তনীয় পেশা পালন করে এবং মানুষের পেশাগুলো সেক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে। জাতি ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের সামাজিক বিন্যাস ও বিধি-নিষেধের ধারাক্রমকে নির্দেশ করে। জাতি ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বংশানুক্রমিক ধারায় একে অপরের থেকে মোচ্চ অবস্থায় অবস্থান করে। হিন্দু ধর্মে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা বিদ্যমান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। রায় নীহাররঞ্জন (১৯৪৯) ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ গ্রন্থে বলেন, হিন্দু ধর্মের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে পঞ্চম স্তরে রয়েছেন ‘অস্পৃশ্য’রা এবং এদেরকে তিনি ‘Out Caste’ হিসেবে উপস্থাপন করেন। জাত ব্যবস্থা কেবল হিন্দু ধর্মের মাঝেই নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মাঝেও রয়েছে। অস্পৃশ্যতার ধারণাও অন্য ধর্মে বিদ্যমান। তবে এটির চর্চা অন্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে চূড়ান্ত অবস্থায় নেই। জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে আন্দ্রে বেতেঁই (১৯৯১) বলেন যে, জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থা পৃথক হলেও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। জাতি হলো ‘বাস্তব সামাজিক গোষ্ঠী বা বিভাগ’- অন্যদিকে বর্ণ হলো একটি ধারণামূলক নকশা। ‘দলিত’ বা সামগ্রিক অর্থে ‘নিম্নজাত’ হিসেবে উপস্থাপিত হয় যার সাথে হিন্দু ধর্মের বর্ণ ব্যবস্থার সম্পর্কও যুক্ত। ভারতে এদের ‘Schedule Caste’ হিসেবে তুলে ধরা হয়। তবে ‘দলিত’ পরিচিতির সবচেয়ে বড় যুক্ততা ‘অস্পৃশ্যতার ধারণার স্বার্থে। সমাজ শুচি-অশুচির ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে এর মোচ্চ বিন্যাসকে টিকিয়ে রাখে বলে লুই ডুমো (১৯৭০) দাবি করেন। মোচ্চতার এই বিন্যাসের মধ্যে দলিতদেরকে বৃহত্তর গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্র শুধু টিকিয়েই রাখে না, বরং তাদের জন্ম ও পেশার ভিত্তিতে সুযোগবঞ্চিত, অস্পৃশ্য, অচ্ছুতের জীবন নির্দিষ্ট করে দেয়।

মুসলমান হলেও দলিতরা উচ্চশ্রেণীর

* গবেষক
** অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মুসলমানদের সমান অধিকার ভোগ করতে পারছে না। হিন্দু হলে তাদের ধরা বা ছোঁয়া কেনো দ্রব্য অভিজাত হিন্দুদের কাছে কেবল নিষিদ্ধই নয়, পাপ হিসেবে গণ্য হয়। এরা অনেকেই সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও উচু বর্ণের লোকদের সাথে একত্রে মন্দিরে বসে উপাসনার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

'দলিত'দের এই বঞ্চনার ঐতিহাসিক পথ পরি□মায় সমাজের নির্যাতিত, অধিকার বঞ্চিত ও দলিত পীড়িত মানুয়ের প্রথম 'দলিত' পরিচিতিকে তুলে ধরেছিলেন 'দলিত' শ্রেণীরই প্রতিনিধি ভারতীয় সংবিধান প্রনয়নকারী কমিটির প্রধান ড. ভিমরাও আম্বেদকর। তিনি গান্ধীজির মতো শুধু নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের 'হরিজন' পরিচিতি মেনে না নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং আপামর বিভিন্ন নীচু জাত ও বর্ণের মানুষজন যারা বিভিন্ন ধর্মের কিন্তু সামাজিকভাবে বঞ্চিত তাদের সামগ্রিক পরিচিতি 'দলিত' হিসেবে আখ্যায়িত করে বঞ্চনার বিরুদ্ধে কথা বলেন। বর্তমানে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রেই ধর্ম, ভাষা ও অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে, পেশার কারণে বিভিন্ন নাম ও গোত্রের মানুষকে সামগ্রিকভাবে বঞ্চনার পরিচিতির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য 'দলিত' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম-এর গবেষণায় ষাটটিরও অধিক জাতকে এবং প্রায় ৫৫ লাখ জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে 'দলিত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে ডোম, মেথর, নাপিত, মালা, মাদিগা, লালবেগি, বাল্মিকি, জলদাস. কুমার, তেলি, বিহারি, হাজাম, কসাই, বেদে, মরুকর, কানপুরি, তেলেগু, বাঁশফোর, ঋষি, কাওরা, বেহারা, জেলে, দাই, ধোপা, শিকারি, বুনো প্রভৃতি। এদের মধ্যে কেউ ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে এসেছেন। বিভিন্ন আশা দিয়ে, স্বপ্ন দেখিয়ে বৃটিশরা তাদের ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। আবার কেউ বাঙালি মুসলমান 'দলিত' যারা বিভিন্ন সময়ে ক্ষেতখামারে কাজ, ভ্যান রিকশা চালনা, ইটভাটায় কাজ করে কিংবা ভিন্নতর পেশায় জড়িত হয়েও 'অস্পৃশ্যতা' হতে মুক্তি পাচ্ছে না।

ঢাকার গাবতলীর সিটি কলোনির 'দলিত'দের জীবন ব্যবস্থার দিকে তাকালে পুরো দেশের 'দলিত'দের জন্ম ও পেশার ভিত্তিতে যে সামাজিক বঞ্চনার পরিসর তার একটা ধারণা

পাওয়া সম্ভব। তাই নির্দিষ্ট এলাকার তেলেগু 'দলিত' জনগোষ্ঠীর মাঝে দেখা যায়। তাদের জীবনে অর্থনৈতিক অপ্রতুলতার বিষয়টি তারা জন্মসূত্রেই পেয়েছে এবং তা পেশার কারণেই সৃষ্ট। কেননা এরা বেশির ভাগই সিটি কর্পোরেশনে অস্থায়ী ভিত্তিতে চাকরি করে দৈনিক সর্বোচ্চ দেড়শ থেকে দুইশ টাকা পারিশ্রমিক পান। কলোনির বাঙালিরাই সাধারণত স্থায়ী চাকরি করেন।

আবাসন স্থানের চরম দুরবস্থা দশ বাই বার ফিট ঘরে দুই থেকে তিন প্রজন্মের বাস, নেই কোনো আলাদা রান্নাঘর, নেই কোনো বাথরুম যে বাস্তবতা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না বা জানার চেষ্টা করছি না কিংবা জেনেও মেনে নিচ্ছি। তাদের নেই কোনো বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা, নেই কোনো পয়ঃনিষ্কাশণ ব্যবস্থা, মাত্র পাঁচটি স্যানেটারি পায়খানায় পুরো কলোনির 'দলিত'দের পয়ঃকাজ সারতে হয়। সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে যারা নিযুক্ত তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে নেওয়া হয়নি কোনো ব্যবস্থা তাই পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রবল।

যে টাকা উপার্জন করতে পারে 'দলিত'রা তা দিয়ে কোনোভাবেই সন্তানদের শিক্ষা থেকে শুরু করে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ কিংবা উপযুক্ত চিকিৎসা নেয়া সম্ভব হয় না। তারপর রয়েছে স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে অসম্মান, চিকিৎসা নিতে গিয়ে হাসপাতালে দুর্ব্যবহার, ডাক্তারের ঠিকমতনে যত্ন না নিয়ে দেখা, দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় রাখার মতো বিষয়। পেশার পরিবর্তন না ঘটাতে পারার বাস্তবতায় দলিত শিক্ষার্থীরা স্কুল বা কলেজের এক পর্যায়ে শিক্ষিত হওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সমাজ তাদের পরিচ্ছন্নতা কর্মীর পেশাতেই রাখতে চায়। 'দলিত' নারীদের বঞ্চনা আরো তীব্র। একদিক দিয়ে 'দলিত' হিসেবে, অন্যদিকে 'দলিত' নারী হিসেবে। কেননা 'দলিত' পুরুষপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবমূল্যায়ণ করা হয়। তবে সারা দেশের 'দলিত'দের বাস্তবতা ঠিক যে একই রকম তা কখনোই দাবি করা সম্ভব নয় এবং তা করা হচ্ছেও না। কিন্তু বাংলাদেশের ৫৫ লাখ 'দলিত' জনগোষ্ঠী কোনো না কোনোভাবে জন্ম ও পেশার কারণে সামাজিকভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। গাবতলীর দলিতদের জীবনকে তারই একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ■

তথ্যসূত্র:

Ambedkar, BR (1945), What Congress & Gandhi have done for the Untouchables, Thacker, Bombay.

Dumont.L. (1970), Homo Hierarchicus: The Cast System & It's Implication, Widen feld & Nicolson.

Marx.K (1851) Poverty of philosophy; Oxford University Press, London.

Srinivas, M.N. (1987), The Dominant Caste & Other Essays, Oxford India Paperbacks.

বন্দোপাধ্যায়,শেখর ও দাশগুপ্ত,অভিজিৎ সম্পাদিত (১৯৯০), জাতি,বর্ণ ও বাঙ্গালী সমাজ, আইসিবিএস, দিলি-।

পারভেজ, আলতাফ সম্পাদিত, (২০০৯),আম্বেদকর কেন বাংলাদেশে জরুরি, বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আন্দোলন ও নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

তথ্য অধিকার ও দুর্নীতি দমন

ড. সাদেকা হালিম*

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবন যাপন করে। তারা মৌলিক চাহিদাগুলো ঠিকমতো পূরণ করতে পারে না। অথচ এই দেশে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ সমাজের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি করে বিত্তশালী হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিশীল চাকাকে পেছন দিক থেকে জোরেশোরে লাগাম টেনে ধরছে। দেশের অর্থনীতি দ্বারা ভারাক্রান্ত হচ্ছে, এমন সময়ে যুগোপযোগী তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। আজ পর্যন্ত প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও দেশের আপামর জনসাধারণের একটি বিশাল অংশ এখনো তথ্য অধিকার আইন কী, কোথায় কোথায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার/প্রয়োগ করা যায়, তথ্য না পেলে কোথায় কোথায় অভিযোগ ও আপিল করতে হয়– এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। তথ্য অধিকার হলো মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। পৃথিবীর প্রায় ৮৮টি দেশ 'তথ্য অধিকার'কে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে দুর্নীতি প্রতিরোধ, দায়িত্বশীল সরকার, গণতন্ত্র বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। অন্যদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন অ্যাক্ট (২০০৪)- এর উদ্দেশ্য হলো দুর্নীতির বেড়াজাল থেকে দেশকে রক্ষা করা। অর্থাৎ বাংলাদেশের যে স্তরেই দুর্নীতি হোক না কেন, এ আইন ব্যবহার করে তদন্ত ও অনুসন্ধান করে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্নীতি দমন আন্দোলনের ধারাকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করতে তথ্য অধিকার আইন মাইলফলক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যদিও বাংলাদেশ সংবিধানে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই, তবুও সংবিধানের ৯, ৩২ এবং ৩৯ ধারাকে আমরা তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯- এর ৮টি অধ্যায়ে ৩৭টি ধারা রয়েছে। এসব ধারার মধ্যে ৭টি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২০টি বিষয়ে সরকার তথ্য দিতে বাধ্য নয় এবং ধারা ৩২ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়। তবে এসব সংস্থা থেকে দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য জনগণ পেতে পারে। তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য দিতে বাধ্য এবং এ আইন ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তি সম্ভব। তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে, 'কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।' এই আইনকে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিকরা শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

তথ্য অধিকার আইন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন অ্যাক্ট উভয়কেই সম্মিলিতভাবে দুর্নীতি দূরীকরণে ব্যবহার করা যায়। দুই আইনেই কমিশনকে নিজস্বভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দুটি কমিশনই স্বাধীন কিন্তু সাংবিধানিক নয়। ক্ষমতা এবং কার্যক্রমের দিক থেকে তথ্য কমিশন তদন্ত করতে পারে এবং আবেদনকারীর চাহিত তথ্য নির্দিষ্ট কার্যদিবসের মধ্যে না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করলে তথ্য কমিশন তা নিষ্পত্তি করতে পারে। অন্যদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনও ক্ষমতা ও কার্যক্রমের দিক থেকে দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্ত ও অনুসন্ধান করতে পারে এবং মামলা দায়ের করতে পারে। তথ্য কমিশনের প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– বিভিন্ন ধরনের সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দেয়া, ওয়েব পোর্টালে তথ্য হালনাগাদ করা ইত্যাদি। তথ্য অধিকার আইনে বলা

* তথ্য কমিশনার

ক্ষেত্রে 'Code of Civil Procedure - 1908' প্রযোজ্য হবে। যেমন– সমন জারি, কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনের সামনে উপস্থিত করতে বাধ্য করা, হলফনামার মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করা। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আইনানুযায়ী 'The Code of Criminal Procedure'- এর মাধ্যমে সাক্ষী তলব করা, অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্তকে জেরা করা, বেসরকারি দলিলপত্র উপস্থাপন করা এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইন ২০০৪-এ বলা হয়েছে, দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা প্রধান দুর্নীতি দমন কমিশনার যে কোনো স্থানে তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার অধস্তন যে কোনো অফিসার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারবেন অথবা আইন বা নিয়ম লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করতে পারবেন। অন্যদিকে তথ্য অধিকার আইনে উলেৱখ আছে, যদি কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্দিষ্ট কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান না করেন তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমিশন ৫০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪- এ বলা হয়েছে, অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে। লক্ষণীয়, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন পরিবর্তনের বিলে বলা হয়েছে, বিচারপতি, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকারি আমলাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাখিলের আগে 'দুদক'কে অবশ্যই সরকারের অনুমতি নিতে হবে। তবে 'দুদক' মনে করে, আইনের এমন প্রয়োগের ফলে 'দুদক' অধিকতর দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়বে এবং সেটা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা সম্ভব। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে অস্থিরতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ১০০ ব্যক্তিকে তদন্ত কমিটি শনাক্ত করেছে। এই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক বলয় এবং সরকারি উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। পুঁজিবাজারের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা হতাশ হয়েছেন যখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। অনেক রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব উপদেশ দিয়েছেন তথ্য অধিকার আইনকে ব্যবহার করে কীভাবে তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায় এবং কি কি ধরনের দুর্নীতি পুঁজিবাজারে ঘটেছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে। কারণ এখানে ৩৩ লাখ মধ্যবিত্ত বিনিয়োগকারীর জীবন জড়িত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত প্রতিবেদন আংশিক প্রকাশ করা হবে বলে মতপ্রকাশ করায় ধারণা করা হচ্ছে সরকার শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের রক্ষার চেষ্টা করছে। দুর্নীতি বিষয়ক তাত্ত্বিকদের মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতির অন্যতম কারণ হলো, রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার আগে যেসব প্রতিশ্রৱতি দেয়, ক্ষমতায় যাওয়ার পর সেগুলো ভুলে যায়। তারা নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে বিভিন্ন দুর্নীতিপরায়ণ কাজে লিপ্ত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারি কর্মকর্তারা প্রশাসনিক, অর্থনীতি বিষয়ক কোনো তথ্য দিতে চান না। 'সরকারি তথ্য জাতীয় সম্পদ'– এ সত্যটি প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এই বিষয়ক তথ্য প্রকাশে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

জনগণকে যতবেশি তথ্য দেয়া যাবে, সরকারের দায়িত্বশীলতা ততই বৃদ্ধি পাবে। বিপরীত দিকে যতো বেশি তথ্যের সীমাবদ্ধতা থাকবে; সরকারের ক্ষমতা, দায়িত্বশীলতা ততো বেশি কমতে থাকবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন পরিবর্তনের বিলে বলা হয়েছে, বিচারপতি, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকারি আমলাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাখিলের আগে 'দুদক'কে অবশ্যই সরকারের অনুমতি নিতে হবে। তবে 'দুদক' মনে করে, আইনের এমন প্রয়োগের ফলে 'দুদক' অধিকতর দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়বে এবং সেটা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

তথ্য ছাড়া জনগণ তাদের তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে না। যেমন– যখন বাজেট প্রকাশ করা হয় তখন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্যে প্রতি জনগণের অভিগম্যতা থাকা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইন চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের জবাবদিহি যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। তথ্য কমিশনের প্রথম অভিযোগ দাখিল করে বেলা রাজউকের কাছে হাতিরঝিলে বিজিএমইএ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত রিপোর্ট চাইলে বেলাকে তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। পরে কথ্য কমিশনের হস্তক্ষেপে বেলা তথ্য পায়। তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত ৪০টির অধিক অভিযোগ পেয়েছে এবং এর মধ্যে ৩৩টি অভিযোগ নিস্পিত্তি করেছে। অধিকাংশ অভিযোগকারী দরিদ্র মানুষ যারা তথ্য পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। যেমন– সরকার বিনামূল্যে কি কি ওষধ বিতরণ করে, কৃষির ওপর ভর্তুকির পরিমাণ, ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড বিতরণ বিষয়ে। পরিশেষে বলা যায়, তথ্য অধিকার আইন ও দুর্নীতি দমন আইন সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রশাসনিক/বেসরকারি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি হ্রাসকরণ সম্ভব। ■

সরকার ও মানবাধিকার কমিশন পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয়

- ড. মিজানুর রহমান

ড. মিজানুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান। বর্তমানে তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং সৃজনশীল একজন মানুষ। জীবনে কোনোদিন কোনো পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় হননি। ছাত্রদের কাছেও তিনি অত্যন্ত প্রিয় এবং কাছের একজন শিক্ষক। ২০১০ সালে তিনি 'দক্ষিণ এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আইন শিক্ষক' পুরস্কার লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও তিনি সুইডেনের Umeo এবং নরওয়ের ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় দেশীয়-আন্তর্জাতিক সংগঠনে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। নাগরিক উদ্যোগের সাথে তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন।

মানবাধিকার কমিশনের মূল কার্যক্রম কি?

আমাদের সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের যেসব স্বীকৃত মৌলিক অধিকার রয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যই মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ২০০৯ সালের আইনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় কাজ করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যাতে নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর-নির্দয়-অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করার দায় মানবাধিকার কমিশনের ওপর বর্তায়। তেমনি আমাদের দেশের মানুষ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কি না, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কি না, ধর্মীয় অধিকার লাভে কোনো বঞ্চনার শিকার হচ্ছে কি না সেগুলো দেখার দায়িত্বও আমাদের। এদিক থেকে মানবাধিকার কমিশন এক বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্যে আছে।

মানবাধিকার রক্ষা এবং মানবাধিকার শিক্ষা বিকাশে এ কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

বাংলাদেশে একটি মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করাই মানবাধিকারের উদ্দেশ্য। এজন্য মানবাধিকার শিক্ষা যেমন প্রয়োজন তেমনি মানবাধিকার সচেতনতা এবং অধিকারভিত্তিক মানসিকতা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন 'অধিকারভিত্তিক অথচ দায়িত্ব নির্দেশক' একটি কৌশল গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা নানান কর্মসূচি গ্রহণ করছি এবং ভবিষ্যতেও করবো। যেমন– নিয়মিত সভা-সেমিনারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এর বাইরের আমরা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে গোষ্ঠী বা পেশাভিত্তিক, কিংবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাভিত্তিক যেসব অধিকারের বিষয়ে তাদের জানা দরকার সেগুলো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবো।

বর্তমানে মানবাধিকার কমিশনে মানুষ সাধারণত কি ধরনের অভিযোগ নিয়ে আসছে?

আমাদের কাছে যে অভিযোগগুলো আসে তার একটি বিরাট অংশ আসে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে। যেমন– থানায় জিডি অথবা এফআইআর করতে চায়, তা করতে দেয়া হচ্ছে না, বা যে তদন্ত প্রক্রিয়া চালু হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। অর্থাৎ যে ধরনের সক্রিয়তা নাগরিকরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আশা করেন তা না পেলে তারা আমাদের কাছে আসছেন। আবার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যেমন– বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড- এর প্রতিকার দাবি নিয়েও তারা আসছেন। আবার চাঁদাবাজি, ঘুষ গ্রহণ, পেনশন না পাওয়া, নারী নির্যাতন পারিবারিক বিরোধ, ভরণপোষণ, তালাক, দেনমোহর আদায়ের অভিযোগও আমাদের কাছে আসছে। আমরা এগুলোর সমাধানে কাজ করছি।

এ অভিযোগগুলোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কমিশন কি উদ্যোগ গ্রহণ করে?

পৃথিবীর কোনো দেশেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে নির্বাহী ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কেবল ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ক্ষতিপূরণ প্রদান করার নির্দেশ দিতে পারে। এ অধিকার আমাদের থাকলে দায়িত্ব পালন আরো

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সোমা দত্ত, নাগরিক উদ্যোগ।

সহজ হতো। বর্তমানে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানবাধিকার কমিশনের মতোই মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্রগুলোকে প্রকাশ ও শনাক্ত করা এবং প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করছি। কিন্তু আপনারা জানেন, সব অভিযোগই আমাদের কাছে আসার কথা নয়। আইনে বলা আছে, যেসব বিষয়ে ইতোমধ্যে মামলা হয়েছে বা বিচারাধীন আছে সেখানে আমাদের কোনো করণীয় নেই। তবে মনে করুন– কোনো একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে মামলা হয়েছে সেখানে রাষ্ট্রের উদাসীনতা লক্ষ করা যাচ্ছে অথবা বিচার প্রা□য়া কোনোভাবে অন্য পক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, এগুলো ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা রোধ করে। আমরা এখানে ভূমিকা পালন করতে পারি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে কমিশনের ভূমিকা কি থাকে?

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তদন্তের জন্য বলা হয়। তাদের তদন্ত প্রতিবেদন সন্তোষজনক হলে সেই অনুযায়ী আমরা দুই পক্ষকে জানিয়ে দিই। আর যদি তা সন্তোষজনক না হয় তাহলে আমাদের মতামত জানিয়ে আবার তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলি।

এ বিষয়ে কোনো দৃষ্টান্তমূলক সফলতা কি আপনাদের আছে?

দেখুন, কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ যাবৎ ১৮৮টি অভিযোগ রুজু করেছে। তার মধ্যে ১২০টি নিষ্পত্তি করেছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, গত বছরের ডিসেম্বরে ঢাকাতে তিন যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এর পেছনে আইন -শৃঙ্খলা বাহিনীর জড়িত থাকার বিষয়ে সন্দেহ ওঠে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের আইজিকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য অনুরোধ করি। তদন্ত কমিটি এ ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কয়েক সদস্যের জড়িত থাকার প্রমাণ পায় এবং তাদের বিরুদ্ধে সংস্থার নিয়ানুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কমিশনের সুপারিশ বা তদন্তের অনুরোধ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কতটুকু আমলে নিচ্ছে বলে মনে হয়?

আমরা কিছুদিন আগে সরকারি শিশু সদন পরিদর্শন করে দেখলাম সেখানে বাচ্চাদের খাবার রান্নার জন্য কোনো বাবুর্চি নিয়োগ করা হয়নি। ছোট মেয়েরাই সেখানে রান্নার কাজটি করছে। আমরা এ ব্যাপারে আশু করণীয় নির্ধারণের জন্য সরকার এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কয়েকদিন আগে আমাকে জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন অনতিবিলম্বে ৬৪টি জেলার শিশু সদনেই একটি করে বাবুর্চির পদ সৃষ্টি এবং একজন বাবুর্চি নিয়োগের জন্য। অর্থাৎ আমাদের সফলতা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত তা বিলম্বিত হতে পারে।

আমাকে যদি আর একজন মানুষও দেয়া না হয়, আমরা যে কয়জন আছি, হেঁটে যতটুকু যাওয়া যায় তার মধ্যেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করবো। মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা সহ্য করা হবে না।

মানবাধিকার কমিশনের কাজের ক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কি?

এক ধরনের চ্যালেঞ্জ সব সময় আছে। এটি শুধু আমাদের জন্যই প্রযোজ্য নয়। পৃথিবীর সব দেশের মানবাধিকার কমিশনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের মূল কাজ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করা, সেগুলোকে প্রচার করা, যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ কমিশনের অন্যতম কাজ হলো সরকারের নানান কর্মকাণ্ডের □টি ধরা এবং সমালোচনা করা। এজন্য প্রায়ই মানবাধিকার কমিশনকে সরকার বিরোধী বলে ভুল করে থাকে। কেউ কেউ বলে থাকেন, এরা সরকারকে বিব্রত করার জন্য কাজ করছে কিংবা বিরোধী দলের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছে অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। এটা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে সরকারকে খুব সজাগ থাকতে হবে।

তাহলে কি সরকার ও মানবাধিকার কমিশন পরস্পরের প্রতিপক্ষ?

মানবাধিকার কমিশন যখন কারো মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা বলে এবং এ জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে তখন নিরপেক্ষ জায়গা থেকেই বলে। সরকার যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের দু'একজনকে বাঁচাতে গিয়ে পুরো সমাজ প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলেন তাহলে জনগণের আস্থা নষ্ট হয়। সেই সাথে বলবো, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে সেটা সরাসরি প্রতিহত না করে নিয়মানুযায়ী তদন্ত করুন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কারণ

সরকারের মূল কাজ হলো সাধারণ নাগরিকের কল্যাণ-মর্যাদা সুরক্ষা করা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মূল লক্ষ্যও তাই। আমাদের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সরকার ও মানবাধিকার কমিশন কখনোই একে অপরের প্রতিপক্ষ নয়।

মানবাধিকার কমিশনের সম্পদ ও অন্যান্য কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা কি এবং কিভাবে তা সমাধান সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

আমাদের নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন– আইনগত সীমাবদ্ধতা। আমাদের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। আমাদের কাজ দেওয়ানি আদালতের মতো। আমরা যে কারো বিরুদ্ধে সমন জারি করতে পারি এবং তখন সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তর এবং তথ্য দিতে বাধ্য। কিন্তু সমন জারি করার পর কেউ যদি তা উপেক্ষা করেন তাহলে কিভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো এই ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। আমাদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা নেই। আইনের আরো কিছু দুর্বলতা আছে। সেগুলোকে ঠিক এ মুহূর্তে প্রথম সারিতে নিয়ে আসছি না। কারণ আমি আমার যতটা ক্ষমতা দেয়া আছে ততটুকু পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগের কার্যকর পরিবেশ দাবি করছি। এরপর হয়তো একটি সময় আইনের সংশোধনের জন্য কাজ করা যাবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা। আমাদের জাতীয় বাজেট থেকে বরাদ্দ দেয়া হয় আইন প্রণয়ন এবং খসড়া শাখার সাথে সম্পৃক্ত করে। সেখানে বার বার চিঠি লেখার পরও আমরা আশানুরূপ সাড়া পাইনি। অবশেষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে খানিকটা বরাদ্দ আমরা পেয়েছি। তৃতীয়ত, আমাদের লোকবলের সংকট রয়েছে। আমরা ২০১০ সালের ২৩ জুন দায়িত্ব গ্রহণ করি। ওই সময় আমাদের ২৮ জনের একটি জনবল অনুমোদন করেছে সরকার। সেখানে আজ পর্যন্ত একটি লোকও পাইনি। ইউএনডিপি থেকে ধার নিয়ে অফিস চালাচ্ছি।

সম্প্রতি আপনারা পাঁচ বছর মেয়াদি একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এতে মূলত কোন কোন বিষয়গুলো উঠে এসেছে?

কৌশলগত পরিকল্পনায় আমরা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, নারীর প্রতি বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং স্থানীয় মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অভিগম্যতা, আদিবাসী এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার, অভিবাসীর অধিকার, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্য, নাগরিকদের মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং স্বাস্থ্য অধিকার, শিশু অধিকার, শিক্ষার অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ প্রভৃতি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছি। এর মধ্যে ২০১১-১২ সালের জন্য দুটো ক্ষেত্রকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তা হলো– জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং নাগরিকদের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রটি।

এই কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

আমরা এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছি। ইতিমধ্যে যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়েছে সেখানে কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা আহগ্রী ব্যক্তিদের নিয়ে পৃথক কমিটি গঠন করা হবে। তারাই ঠিক করবেন কিভাবে সম্মুখে অগ্রসর হবেন। সেখানেই আমাদের যৌথভাবে কাজ করা বা সহযোগিতার বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে।

দেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলো কিভাবে আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করতে পারে?

আমরা খুব তাড়াতাড়িই সালিশ নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি করতে যাচ্ছি। তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা মানবাধিকার কমিশন করবে। এছাড়া আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার তদন্ত এবং প্রতিকার দাবিতে দেশীয় এবং বিদেশি সংগঠনের সাথে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করছি। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম কাজ হলো সরকারের নানা কর্মকাণ্ডের ত্রুটি ধরা এবং সমালোচনা করা। এজন্য প্রায়ই মানবাধিকার কমিশনকে সরকার বিরোধী বলে ভুল করা হয়। এটা ঠিক নয়।

সম্প্রতি বিদায়ী বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে 'হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাঁতার কাটার" সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই বাস্তবতায় মানবাধিকার কমিশন কতটুকু স্বাধীনভাবে কাজ করছে বলে আপনি মনে করেন?

এ প্রশ্নটি করা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে খুবই যৌক্তিক। গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত মানবাধিকার কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। বিদায়ী বিচারপতি বিচার বিভাগ সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করে গেছেন, আমি তার উত্তরে বলবো হাত-পা সরকার বেঁধে দেয় না। আপনারাই নিজেদের হাত-পা বেঁধে রাখেন। জেগে ঘুমালে সেই ঘুম কেউ ভাঙাতে পারে না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ঘুমিয়ে নেই। ঘুমানোর ভাণও কখনো করবে না। আমরা বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছি এবং প্রতিকারের জন্য কাজ করছি। কারো প্রতি কোনো অনুগ্রহ করার জন্য আমরা এখানে আসিনি। আমরা সকলের সহযোগিতায় ভয়-ভীতি, স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর। আমাকে যদি আর একজন মানুষও দেয়া না হয়, আমরা যে কয়জন আছি, হেঁটে যতটুকু যাওয়া যায় তার মধ্যেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করবো। মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা সহ্য

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও বর্তমান পরিস্থিতি

চিররঞ্জন সরকার*

দেশে একটি 'নারী উন্নয়ন নীতি' ঘোষিত হয়েছে এটা বোধ করি এখন আমাদের কারো অজানা নয়। নারী উন্নয়ন নীতি হিসেবে এটি নতুন নয়, এর আগে আমাদের দেশে আরো কয়েকবার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। বেইজিং প-াস ফাইভ কর্মসূচির অংশ হিসেবেই নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের চিন্তাটা এসেছে। একটি পশ্চাৎপদ সমাজে নারীদের কিভাবে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে তা নিয়ে সরকারের সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্যই দরকার ছিল নীতিমালা। তারই অংশ হিসেবে ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়। সরকারের সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা, নারী অধিকার সংগঠনসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের মধ্যে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে '৯৭ সালের নীতিটি প্রণয়ন করা হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তী সরকার অগণতান্ত্রিক উপায়ে '৯৭-এর নারী নীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে গোপনে ২০০৪ সালে নতুন নারী নীতি প্রণয়ন করে। এ নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের নারী, মানবাধিকার ও এনজিও সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ আসে। ওই নীতিকে পরিবর্তন করার জন্য ভিন্নমুখী ও বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং কয়েক দফা সুপারিশ বিভিন্ন পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের কাছে একাধিকবার পেশ করা হয়। এসবের ধারাবাহিকতায় বৃহত্তর উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের অধিকার ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে ৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশ্ব নারী দিবসে ঘোষণা দেয় নতুন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির। বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন 'নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষিত নারী নীতি'র বিরোধিতা করে এবং এই নীতি বাতিলের দাবি জানায়। তাদের এই অবস্থান ও আন্দোলনের হুমকির মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নারী নীতিটিকে হিমাগারে পাঠিয়ে দেয়। এরপর দীর্ঘদিন নারী নীতি নিয়ে সরকারিভাবে তেমন কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর বহুল আলোচিত দুটি ধারা

'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' নারীদের জন্য বহু প্রতীক্ষিত একটি পদক্ষেপ। এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২৫.১- এ বলা হয়েছে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা এবং ২৫.২ এ উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।' এছাড়া জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৩.৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।' এ ধারায় সম্পদ বলতে অর্জিত সম্পদ বোঝানো হচ্ছে। বর্তমানে দেশের নারীদের একটি বিশাল অংশ মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত।

এ নীতিমালার ২৫.২ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়িত হলে নারীদের প্রাপ্য সম্পত্তি ভোগ, দখল ও বি□য়ের অধিকার অনেকাংশে নিশ্চিত হবে। এ নীতিমালা কোনোভাবেই ইসলামিক আইনের বিরোধিতা করে না। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এবং দুঃখজনক বিষয় হলো একটি গোষ্ঠী ইসলাম রক্ষার নামে হরতাল করে, সহিংসতা ছড়িয়ে এর বিরোধিতা করছে। কিন্তু যখন ইসলামের নামে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ফতোয়া দিয়ে নারী হত্যা করা হয় কিংবা হাজার হাজার নারীকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পদ থেকে যখন বঞ্চিত করা হয় তখন তারা নিশ্চুপ থাকে, ইসলাম রক্ষা করতে এগিয়ে আসে না।

নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে এখানে সমানাধিকার বলতে শিক্ষা, চাকরি ও সকল ক্ষেত্রে যেন নারী-পুরুষ সমান সুযোগ পায় তাই বুঝানো হয়েছে। কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষ যেন নারী থেকে বেশি ভাতা না পায় তার নিশ্চয়তা প্রদানই এ নীতির লক্ষ্য।

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সবক্ষেত্রে যদি নারী-পুরুষ সমানভাবে কাজ করতে পারে তাহলে অধিকারের বিষয়ে কেন হীনম্মন্যতা। সেই কথাই নীতিধারার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

* লেখক ও কলামিস্ট

এখানে আরো লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, নতুন যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে তাতে উলে-খযোগ্য তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির বিষয়ে শুধু ভাষাগত হেরফের হয়েছে মাত্র। ১৯৬১ সালের মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারের বিষয়ে যা ছিল নতুন এ নীতিমালায় তাই রয়েছে। এ নীতিমালায় কোথাও উত্তরাধিকার সম্পদে নারী-পুরুষর সমবণ্টন বা সমঅধিকারের কথা বলা হয়নি। তবে এই নীতির কিছু দিক খুবই ভালো। যেমন– প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও অভিবাসী নারী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ এখানে এসেছে যা আগে কখনো হয়নি।

উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি প্রসঙ্গে নীতিমালায় সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'উত্তরাধিকার হতে প্রাপ্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ থাকবে নারীদের।' কিন্তু সম্পত্তি বণ্টনের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাবেন নারীরা। তবে ওই সম্পত্তির অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়েছে নীতিমালায়।

মৌলবাদীগোষ্ঠীর বিরোধিতা

মুসলিম আইন অনুযায়ী নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক ভাগ পায়। নারী উন্নয়ন নীতিতে এ আইন বহাল রেখে তাদের প্রাপ্য সম্পত্তির ওপর নারীর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সরকার যদি বিপ-বী সরকার হতো তাহলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতো। কিন্তু এ সরকার তা করেনি। কিন্তু যতটুকু করেছে তাতেই অস্থির পরিস্থিতি। ধর্মভিত্তিক দলগুলো সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মিটিং, মিছিল, সমাবেশ এমনকি সহিংস হরতাল পর্যন্ত পালন করেছে।

নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রজাতন্ত্রের মূল আদর্শের একটি প্রতিরূপ। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে উলে-খ রয়েছে 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং একই সাথে মৌলিক অধিকার (তৃতীয়ভাগে) ২৮(১), ২৮(২) রয়েছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না'। 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন'। যারা নারী উন্নয়ন নীতিমালার বিরোধিতা করছেন তারা সরাসরি বাংলাদেশের সংবিধানের বিরোধিতা করছেন, নারীকে মানবসত্তা হিসেবেই গণ্য করছেন না। যারা বিষয়টি নিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করছেন তারা ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন, বরং রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধার করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

আজকের বিশ্বে সভ্যতা এগিয়েছে, মানবতা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, শুধু আমাদের ধর্ম ব্যাবসায়ীরা মানবিক হতে পারেনি। তারা নারীর সামান্য উন্নতি ঘটলে আর অবস্থান ভালো দেখলে 'ধর্ম গেল', 'ধর্ম গেল' বলে হৈচৈ করে ওঠে। নারী ধর্ষণ-নারী হত্যা-নারী পরিত্যক্তা-যৌতুক তালাক দেয়া দেনমোহর না দেয়া, ফতোয়া ও দোররা মারা, পতিতাবৃত্তি-বিদেশে নারী পাচার করে দেহ ব্যবসায় বাধ্য হতে দেখলে এদের হৃদয় কাঁদে না। এরা প্রতিবাদে-বিক্ষোভে সোচ্চার হয় না। তখন এদের ধর্মজ্ঞান জাগে না।

তাছাড়া নিজ নিজ ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী ধর্ম পালন এক কথা এবং জ্ঞানচর্চা, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদিকে শত শত হাজার হাজার বছর আগেকার খুঁটিতে বেঁধে রাখার চেষ্টা হলো সম্পূর্ণ অন্য কথা। অতীতকেই পরিবর্তনের পথ ধরে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে হয় এবং ইতিহাসে সেটাই ঘটে থাকে।

ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধার্মিক লোকের অভাব নেই। তারা যদি তওরেত ও বাইবেলের প্রতিটি অক্ষরের খুঁটিতে নিজেদের বেঁধে রাখতেন, নিজেদের ধর্ম চিন্তাকে ইতিহাসের পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিতেন তাহলে আজ তারা উন্নতির যে পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছেন সেটা সম্ভব হতো না। এই বোধ থেকেই বেদ-উপনিষদ ও মনুর শাসনে আবদ্ধ না থেকে ১৯৪৭ সালের পরই ভারতের তৎকালীন সরকার 'হিন্দু কোড বিল' পাস করে সম্পত্তিতে অধিকারহীন হিন্দু নারীকে সম্পত্তির অধিকার প্রদান করেছিল। আইয়ুব খানের শাসন আমলেও মুসলিম পারিবারিক আইনের উলে-খযোগ্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল।

এখানে আরেকটা কথা না লিখলেই নয় যে, ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনের কয়েকটা যুগান্তকারী বিষয়ের মধ্যে– বিবাহ রেজিস্ট্রি, মৌখিক তালাক বন্ধ, মেয়েদের শর্ত সাপেক্ষে তালাক প্রদানের ক্ষমতা এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এতিম ছেলেদের সঙ্গে এতিম মেয়ে বাচ্চার সম্পত্তিতে অধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। কাজেই আধুনিক মুসলিম পারিবারিক আইন যা ১৯৬১ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে তাকে আরো আধুনিক করলে কোরানিক আইনের সঙ্গে খেলাপের যুক্তি ধোপে টেকে না।

সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্বরে ঘোষণা করেন, 'নারীদের উত্তরাধিকার বিষয়ে কোনো আইন পাস করা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই ... উত্তরাধিকার বিষয়ে কোনো আইন সংশোধন করার মানসিকতা সরকারের নেই' ইত্যাদি। আমরা মনে করি, নারী উন্নয়ন বিরোধী এবং ধর্মভিত্তিক দলের হুমকিতে সরকারের এরকম বক্তব্য এবং নমনীয়তা প্রকাশ করার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

তাছাড়া নারীর প্রশ্নে ধর্মে দোহাই যত বেশি - আসে পুরুষের বেলায় ততটুকু আসে না। সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা কেবল বর্তমানে তথাকথিত ইসলামি দলগুলোই করছে না। এর আগেও হিন্দু নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা উঠেছে, তখনো এটাকে হিন্দু ধর্মের বিরোধী বলে এর বিরোধিতা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ভারতে নারী-পুরুষের সম্পত্তিতে সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একইভাবে ইরাক, সোমালিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়ার মতো মুসলিম দেশে সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

পৈতৃক সম্পত্তিতে মুসলিম মেয়েদের সমান অধিকার না পাওয়ার পক্ষে একটি যুক্তি শোনা

যায় তাহলো, মেয়েরা পিতার কাছ থেকেও পায় আবার স্বামীর কাছ থেকেও পায়, আবার বিয়ের মোহরানার টাকা পায়। এভাবে কার্যত একজন নারীর সম্পত্তি একজন পুরুষেরই সমান হয়ে যায়। এখন মেয়েরা যদি পিতার সম্পত্তিতে সমান ভাগ পায় তাহলে তো নারীর সম্পত্তি পুরুষের থেকে বেশি হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামী কি স্ত্রীর কাছ থেকে সম্পত্তি পায় না? পায়, স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে যতটুকু পায়, স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তি থেকে তার দ্বিগুণ পায়। মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির ১/৮ ভাগ পায় আর স্বামী পায় স্ত্রীর সম্পত্তির ১/৪ ভাগ অর্থাৎ স্বামী পায় দ্বিগুণ। অথচ স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী সম্পত্তি পায় এটা যত বেশি শোনো যায়, স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী সম্পত্তি পায় এটা আমরা খুব একটা শুনি না।

আরো একটি বড় ধরনের প্রচলিত যুক্তি হলো– মেয়েদের বাবা-মার দায়িত্ব নিতে হয় না। বলা বাহুল্য, নারীদের শ্রমকে কেন্দ্র করে যে গার্মেন্ট শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে সেই গার্মেন্টের সিংহভাগ নারীর আয়ে কত পরিবার টিকে আছে সে পরিসংখ্যান আমরা চাইলেই জানতে পারি। এমন মেয়েদের সংখ্যাও অনেক আছে যারা পরিবারের দায়িত্ব পালনের জন্য বিয়ে পর্যন্ত করেননি কিংবা পরিবারের দায়িত্ব নিতে গিয়ে নিজের সংসার ভেঙেছেন। ছেলের এই ভূমিকাগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত অথচ মেয়ের এই ভূমিকা সমাজে স্বীকৃত নয়।

তাই যে মৌলবাদী গোষ্ঠী নারী উন্নয়ন নীতির বিরোধিতা করছে ধর্মের দোহাই দিয়ে, তারা আর যাই হোক, নারীর পক্ষে বা প্রগতির পক্ষের শক্তি নয়। তারা ইসলামের যে মূল দর্শন মানুষে মানুষে সাম্য, মানবতার মুক্তি, তারা উপরোক্ত ভাষ্যের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। একদল মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, মানুষের সাথে মানুষের বৈষম্য বজায় রেখে মানবতার মুক্তি কি আদৌ সম্ভব? এ প্রশ্ন যে কোনো চিন্তাশীল মানুষের মনে জাগবে।

সরকারকে অনমনীয় ও দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে হবে

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষিত প্রণয়নের পর বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক ইসলামি সংগঠনের প্রতিবাদের মুখে সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল মন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্বরে ঘোষণা করেন,

'নারীদের উত্তরাধিকার বিষয়ে কোনো আইন পাস করা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই ... উত্তরাধিকার বিষয়ে কোনো আইন সংশোধন করার মানসিকতা সরকারের নেই' ইত্যাদি। আমরা মনে করি, নারী উন্নয়ন বিরোধী এবং ধর্মভিত্তিক দলের হুমকিতে সরকারের এ রকম বক্তব্য এবং নমনীয়তা প্রকাশ করার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

একটি নীতি প্রণয়নের পর অবশ্যই সেটির পর্যালোচনা, সেটি নিয়ে আলোচনার সুযোগ থাকা উচিত। সেটা নিয়ে আপত্তি, মতভেদ দেখা দিলে সে বিষয়ে মতবিনিময়ও হওয়া উচিত। কিন্তু মতবিনিময় যদি করতে হয় তা হওয়া উচিত এর সাথে যারা সম্পর্কিত অর্থাৎ যারা এর দ্বারা উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই সংশি-ষ্টদের সাথে। এটাই কোনো আলোচনা বা মতবিনিময়ের পূর্বশর্ত।

দেশে নারী আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। নারীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের 'অধিকার আদায়ের' জন্য আন্দোলন করে আসছে, 'উন্নয়ন নীতিমালা'র জন্য নয়, উন্নয়ন ছিল দাবির একটা অংশ। এ দেশে নারী আন্দোলনের ভিত্তি ছিল অধিকারবোধের চেতনা যা চিহ্নিত হয়েছে আমাদের সংবিধানে, যার ভিত্তি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। নারী আন্দোলনের দীর্ঘ সময়ের দাবি উত্তরাধিকারসহ সব সম্পত্তিতে সমান অধিকারের আদায়। কিন্তু বর্তমানে ঘোষিত নীতিমালায় সে সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়নি। তারপরও বিভিন্ন মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন ঘোষিত এ নীতিমালাকে স্বাগত জানিয়েছে, অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত একটি পদক্ষেপ হিসেবে।

আমরা চাই, ১৯৯৭, ২০০৪ ও ২০০৮ সালে ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতির মতো এই নীতির ভাগ্য ঝুলিয়ে না রেখে এটি বাস্তবায়নে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইন ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হোক। পাশাপাশি এই নীতিতে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের চাকাকে সচল রাখার যে অঙ্গীকার করা হয়েছে সে জন্য বিদ্যমান আইন ও নীতির প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। ■

লেখা আহ্বান

'নাগরিক উদ্যোগ' নিয়মিতভাবে মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার সংশি-ষ্ট বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে মননশীল ভাবনা-চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, সাক্ষাৎকার, সমালোচনা, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, সংগঠন এবং ব্যক্তির ইতিবাচক কর্মপ্রচেষ্টা তুলে ধরার চেষ্টা করে প্রতি সংখ্যায়। এ বিষয়ে আপনার লেখা দ্রুত পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। পাশাপাশি পত্রিকা সম্পর্কে যে কোনো গঠনমূলক সমালোচনাও আমাদের প্রয়াস সার্থক করবে।

বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার একটি বিশে-ষণ

ধর্মের অজুহাতে নারী নীতি বিরোধীদের অবস্থান আমাদের সংবিধান, বিদ্যমান আইন, আদালতের নির্দেশ, সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। এরা ধর্মের নামে মাগত অনুন্নয়ন, অপশাসনসহ সর্বপ্রকার আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে দেশকে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে ঠেলে দিতে চায়। এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি। পাশাপাশি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, এ নীতিমালায় যে সমস্ত অস্পষ্টতা রয়েছে সরকার তা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং নারী নীতি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে সেটাই এখন সময়ের দাবি। বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার একটি বিশে-ষণ করেছেন লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ এবং অমিত রঞ্জন দে।

বিষয়/ ইস্যু	নারী নীতি ১৯৯৭	নারী নীতি ২০০৪	নারী নীতি ২০০৮	নারী নীতি ২০১১	মাওলানারা যা বলছেন	নাগরিক সমাজের বক্তব্য
কেন নারী উন্নয়ন নীতি	গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য আছে : জাতীয় জীবনে নারী-পুরুষের বৈষম্য সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; নিশ্চিত করতে হবে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন।	নারী তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর : জাতীয় জীবনে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক মতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	সংবিধান অনুযায়ী নারী সমাজের উন্নয়ন বাংলাদেশের এক অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে : জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা; রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; নারীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।	নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদায় তারতম্য স্বাভাবিক; নারী-পুরুষের কার কি অধিকার তা কোরান-সুন্নাহয় বলা আছে; জাতিসংঘ কর্তৃক তৈরি মানবাধিকার বিধি-বিধান কোরান-সুন্নাহর আলোকে বিশে-ষণ ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না।	তথাকথিত রিভিউ নারীর অধস্তন অবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষেই ওকালতি করছে।
সিডও সনদ প্রসঙ্গে	নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংান্ত সিডও সনদ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সিডও সনদ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	সিডও সনদ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করা এবং তার প্রতি বৈষম্য বিলোপ।	নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	জাতীয় জীবনের নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, নারীকে দেয়া হবে 'ন্যায্য অধিকার'। নারী-পুরুষের তারতম্য আইনগত ফারাক দূর করা মানুষের কাজ নয়, এটি স্বভাবগত। সিডও মুসলিম উম্মাহর সংস্কৃতি বিরোধী। এ নারী নীতি মুসলিম সংস্কৃতির পরিবর্তে পশ্চিমা সংস্কৃতি অনুসরণে নারীদের বাধ্য করার কৌশল মাত্র।	বিশ্বের বহু মুসলিম দেশ সিডও অনুমোদন করেছে। বস্তুত নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা কখনোই মুসলিম উম্মাহর সংস্কৃতি হতে পারে না। এই নারী নীতি নারীদেরকে পশ্চিমা সংস্কৃতির দিকে ধাবিত করবে– এটা সম্পূর্ণই কাল্পনিক ভয়।
সমাজের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আইন	বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা; নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন।	বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা; নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন।	বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা; আইন সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।	বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রনয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।	বিদ্যমান সব বৈষম্যমূলক আইন বিলোপের প্রস্তাব কোরান-সুন্নাহর বিরোধী; বিদ্যমান স্বত্ব আইন, বিয়ে বিচ্ছেদ আইন ইত্যাদি আল-াহতাআলার মহাপ্রজ্ঞা প্রসূত এবং নারীর জন্য কল্যাণকর।	বর্তমান পারিবারিক আইন ইতিহাসে বহুবার সংস্কার হয়েছে। দেশে প্রতিনিয়ত বহু আইন তৈরি হচ্ছে। বৈষম্য ও অসমতা কখনো কল্যাণকর হতে পারে না।

বিষয়/ ইস্যু	নারী নীতি ১৯৯৭	নারী নীতি ২০০৪	নারী নীতি ২০০৮	নারী নীতি ২০১১	মাওলানারা যা বলছেন	নাগরিক সমাজের বক্তব্য
পরিচয়	পিতা-মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়ের ব্যবস্থা করা।	পাসপোর্ট ইত্যাদিতে নাম প্রদানের সময় পিতার সঙ্গে মাতার নামও দিতে হবে।	জন্মনিবন্ধন, সনদপত্র, ভোটার তালিকা ইত্যাদিতে নাম লেখার সময় পিতা-মাতার নাম উলে-খ করতে হবে।	পিতা-মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়ের ব্যবস্থা করা, যেমন– জন্ম নিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উলে-খ করা।	এটি মানবতা বিরোধী। বিয়ে বহির্ভূত সন্তান পিতৃ পরিচয় দিতে পারবে না।	সন্তান পিতা-মাতার পরিচয় দেবে– এটি মানবতা বিরোধী হয় কিভাবে? বিয়ের প্রলোভোনে সম্পর্ক স্থাপন ও ধর্ষণের কারণে যে সন্তান জন্ম নেয় এর দায় থেকে পুরুষকে রক্ষার জন্য মরিয়া মাওলানারা।
বাল্যবিয়ে, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি নির্মূল প্রসঙ্গে	বাল্যবিয়ে, মেয়েশিশু ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ; পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন বন্ধ করা।	বাল্যবিয়ে, পাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।	বাল্যবিয়ে, মেয়েশিশু ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ; পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা।	বাল্যবিয়ে, কন্যাশিশু ধর্ষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা; পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা।	১৮ বছরের কম বয়সীর বিয়ে হলেই তাকে বাল্যবিয়ে বলা হচ্ছে– এটি ঠিক নয়। মেয়ে সাবালিকা হলেই বিয়ে দিতে হবে। সাবালিকা হওয়ার আগে মেয়ে বিয়ে দিলেই বাতিল বলে গণ্য করা ঠিক নয়।	এখানে আসলে নারী নীতি নয়, মাওলানারা বাল্যবিয়ে, ধর্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিদ্যমান আইনেরই বিরোধিতা করেছেন।
সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস থেকে নারীকে রক্ষা	সংঘর্ষ ও যুদ্ধে নারীর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।	সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।	সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো, শান্তি মিশনে নারীদের অন্তর্ভুক্তি।	সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সচেতনতা সৃষ্টি করা; সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি রায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা; আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।	শান্তি স্থাপনে নারীদের পাঠালে দেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ধারা বিলুপ্তি করতে হবে।	একজন নারী আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে অবদান রাখলে ধর্মের কি ক্ষতি হবে? ধর্মের কথা বলে নারীকে বোকা বানানো হচ্ছে।
সম্পদে ব্যবস্থাপনা ও উত্তাধিকার প্রসঙ্গে	উপার্জনের সুযোগ, উত্তাধিকার, সম্পদ ও ভূমির ওপর অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ দেয়া।	কর্মসংস্থান বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ দান।	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীর সমান সুযোগ ও নিয়ন্ত্রণ অধিকার দেয়া এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রনয়ণ।	উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।	এটি কোনো অবস্থায় মেনে নেয়া যায় না। ইসলাম পৈতৃক উত্তরাধিকারে নারীকে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক প্রদান করেছে। সুতরাং উত্তরাধিকারে যদি নারীকে পুরুষের সমান অংশ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়, তাহলে এটি হবে সুস্পষ্ট কোরান বিরোধী। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্মীয় আইন চালু রাখতে হবে।	২০১১ সালের নারী নীতিতে ভাষার মারপ্যাঁচ রয়েছে। সেখানে সম্পদে সমান সুযোগের কথা বলা হলেও উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা অনুপস্থিত। যেটি ১৯৯৭ সালের নারীনীতিতে ছিল। মাওলানারা যাকে ধর্মীয় আইন বলেছেন তা তাদের প্রিয় পাকিস্তানেও বহুবার সংশোধিত হয়েছে।

বিষয়/ইস্যু	নারী নীতি ১৯৯৭	নারী নীতি ২০০৪	নারী নীতি ২০০৮	নারী নীতি ২০১১	মাওলানারা যা বলছেন	নাগরিক সমাজের বক্তব্য
রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো	জাতীয় সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন বাড়ানো এবং সেখানে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান; স্থানীয় সরকারেও একই ব্যবস্থা করা।	জাতীয় সংসদে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	সংসদে নারীদের জন্য আসন বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকারে নারীদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসনে উলে-খযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ।	রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর সি্রয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা; সংসদে নারীদের জন্য আসন বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকারে নারীদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, মন্ত্রিপরিষদ ও প্রশাসনে উলে-খযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ।	এই ধারা ইসলাম, গণতন্ত্র ও সংবিধান বিরোধী– এটি পুরুষদের জন্য বৈষম্যপূর্ণ। নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন পুরোপুরি বাতিল করতে হবে।	আমাদের মাওলানারা নারীকে কোনো রাজনৈতিক অধিকার দেবে না– এ বক্তব্যে তা স্পষ্ট; অথচ অধিকাংশ মুসলিম দেশে নারীর রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে।
বাজেট প্রি্রয়ায় নারীর জন্য বরাদ্দ	জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অনুসরণ; নারী উন্নয়নে সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয়ের নারীর স্বার্থে অনুকূল কর্মসূচিতে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া।	পরিকল্পনা কমিশন সকল খাতে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ভৌত ও আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দ করবে	জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট করা হবে, তৃণমূলে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ ও কর্মকর্তাদের জেন্ডার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে	নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যি্রম অব্যাহত রাখা; জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা এবং মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল বাজেট প্রি্রয়া অনুসরণ অব্যাহত রাখা। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা; জেন্ডার ভিত্তিক পৃথক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা কেন্দ্র, ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গসমূহ নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সংবলিত জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ গড়ে তুলবে। সংশি-ষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দফতর, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সকল কাজের জন্যে জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।	ন্যায্য পাওনা বিষয়ে কোরান-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।	নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হলে তাতে কোরান-সুন্নাহর লঙ্ঘন হতে পারে না

বিষয়/ইস্যু	নারী নীতি ১৯৯৭	নারী নীতি ২০০৪	নারী নীতি ২০০৮	নারী নীতি ২০১১	মাওলানারা যা বলছেন	নাগরিক সমাজের বক্তব্য
নারী শিক্ষা	নারী শিক্ষায় স্পষ্ট নীতি অনুসরণ; দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েশিশুর সমানাধিকার নিশ্চিত করা।	গুণগত শিক্ষার সকল স্তরে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করা; সকল প্রশিক্ষণে নারীকে সমান সুযোগ দেয়া।	নারী-পুরুষের অধিকার সম্পর্ক বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হবে।	নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণ করা; নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত কন্যাশিশু ও নারী সমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা; কন্যাশিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা; মেয়েদের জন্যে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা	নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড় করানো যাবে না। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাংলাদেশের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে।	এখানে বিরোধিতার মধ্য দিয়ে পর্যালোচনা কমিটি পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিল, নারী শিক্ষিত হয়ে পুরুষের সমকক্ষ হোক– এটা তারা চায় না।
নারীর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা	নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা অন্বেষণ ও গ্রহণ করা হবে।	নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপাক্ষীয় সহযোগিতা উৎসাহিত করা।	জাতিসংঘের সংশি-ষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণে অনুপ্রাণিত করা।	নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা।	জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সনদ প্রণীত হয় পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কোরান-সুন্নাহর বিধানের কোন খেলাপ করা যাবে না।	বাংলাদেশ জাতিসংঘের সা□য় সদস্য। বিশ্বের বহু মুসলিম দেশ জাতিসংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মাওলানারা বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের মত বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান।
সংস্কৃতিতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ	সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; নাটক ও চলচিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করতে সরকারি অনুদান দেয়া।	□াড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	নাটক ও চলচিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করতে সরকারি অনুদান দেয়া।	□াড়া ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক □াড়া কমপে-ক্স গড়ে তোলা; নাটক ও চলচিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা।	বিনোদনের ক্ষেত্রে শরিয়ত বিরোধী নির্লজ্জতা ও অশ-ীলতা উৎসাহকারী কর্মকাণ্ড পরিহার করতে হবে।	তথাকথিত শরিয়তের দোহাই দিয়ে নারীকে চৌহদ্দি থেকে অপসারণ করার ইঙ্গিত স্পষ্ট।
ফতোয়া	নারীর জন্য মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য না করার জন্য সচেতনতায়ন কর্মসূচি গ্রহণ।	নারীর স্বার্থ পরিপন্থী, প্রচলিত আইন বিরোধী কোনো বক্তব্য, কাজ বা উদ্যোগ নেয়া যাবে না।	কোনো ধর্ম বা অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারীস্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ না করা।	কোনো ধর্ম বা অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোনো বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ কিংবা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করা।	ধর্মীয় শাসনকে কেন্দ্র করে অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যাবে না।	মাওলানারা ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণে আগ্রহী। গ্রামগঞ্জে প্রায়ই ফতোয়ার নামে নারী বর্বরতার শিকার হয়। ফতোয়া আইনের শাসনের পরিপন্থী।

গৃহ শ্রমিকের জন্য আইনি সুরক্ষা- আর কত অপেক্ষা?

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ*
নাজমা ইয়াসমীন**

দীর্ঘকাল ধরে গৃহ শ্রমিকরা পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে আসছে। আমাদের সমাজ-সংসারে কখন থেকে গৃহ শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটেছে তার সঠিক তথ্য কারো জানা নেই। বেঁচে থাকার তাগিদে আর জীবনের প্রয়োজনে যারা অন্যের বাড়িতে অর্থের বিনিময়ে বা দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে-পরে জীবনধারণের উদ্দেশ্যে শ্রমদানের জন্য খণ্ডকালীন অথবা পূর্ণকালীন গৃহাবস্থানে নিযুক্ত হন তারাই মূলত গৃহ শ্রমিক। বর্তমানে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর যোগদানের হার বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিশেষ করে শহর এলাকায় গৃহ শ্রমিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত প্রায় সকল পরিবারেই গৃহ শ্রমিক রয়েছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই এই গৃহশ্রমিকের কাজে নিয়োজিত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজে এ পেশাকে কখনোই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। তাদের শ্রমিক হিসেবেও কোনো স্বীকৃতি নেই। তাদের মজুরি নির্ধারণ ও অন্যান্য অধিকার সুরক্ষায় এখনো কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বিপুল সংখ্যক এই জনগোষ্ঠীর শ্রম 'উৎপাদনশীল শ্রম' হিসেবেও স্বীকৃতি পায়নি। জাতীয় আয়ের কোনো হিসাবেই তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কোনো মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি, এমনকি উলে-খ পর্যন্ত করা হয় না। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বিষয়টি সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। গৃহকাজে নিয়োজিতদের বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬- এ আওতামুক্ত রাখায় তারা সকল ধরনের আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং বিভিন্ন অজুহাতে তাদের ওপর চলে নানান নির্যাতন। গৃহ অভ্যন্তরে থেকেও তারা নিরাপদ নয়, তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ উভয়ই বাধাগ্রস্ত। শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে এরা গৃহভৃত্যের কাজ করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ থাকে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকের ওপর হয়রানি, নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্রের পাতা খুললেই চোখে পড়ে গৃহ শ্রমিক হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণের খবর। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নির্যাতনের নতুন মাত্রা। যেমন– গৃহ শ্রমিকদের হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়া, ছাদ থেকে ফেলে দেয়া, দিনের পর পর অভুক্ত রাখা, বছরের পর বছর ঘরে আটকে রাখা, মুখে কাপড় গুঁজে, গরম খুন্তি-ইস্ত্রি দিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালানো। দেশের আইন আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গৃহকর্ত্রী-গৃহকর্তা কিংবা তাদের আত্মীয়-স্বজন অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে নারী ও ছোট শিশু গৃহ শ্রমিকদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। গৃহ শ্রমিক নির্যাতনের মামলাগুলো অধিকাংশই আদালতে চূড়ান্ত রায় পায় না। অল্প টাকার বিনিময়ে অনেক সময় মাত্র ৫ থেকে ২০ হাজার টাকায় হত্যা, ধর্ষণ কিংবা অমানবিক নির্যাতনের শাস্তিযোগ্য মামলার বাদীরা অভিযুক্তদের সাথে রফা করে মামলা তুলে নিতে বাধ্য হন। হত্যাকারী, নির্যাতনকারী কারোরই সুনির্দিষ্ট শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে গত ১০ বছরে গৃহ শ্রমিকদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৭৯৭টি। এর মধ্যে নির্যাতনে নিহত হয়েছে ৩৯৮ জন, নির্যাতনে আহত হয়েছে ২৯৯ জন এবং অন্যান্য নির্যাতনের শিকার প্রায় ১০০ জন। এ বছর জানুয়ারি থেকে ২ জুন পর্যন্ত নির্যাতন ও অন্যান্য সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছে ১৮ জন গৃহ শ্রমিক এবং নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৮ জন (সূত্র : বিল্‌স)। এই ধরনের নির্যাতন বন্ধ করা যেত যদি সরকার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করত এবং জনসমক্ষে তা প্রচার করত। যে মানুষের শ্রমে ঘামে আমাদের সমাজ সংসার সুন্দর থাকে তাদের ওপর হত্যা, নির্যাতন, হয়রানির ঘটনায় সমাজ-সভ্যতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

গৃহ শ্রমিকদের প্রতি নির্যাতন বন্ধে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে– গৃহ শ্রমিকদেরকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা, শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

* সহকারি নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ বিল্‌স
** প্রকল্প কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ বিল্‌স

করা, নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা, পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা, শ্রমমান নির্ধারণ করা (মজুরি, কর্মঘণ্টা, চিকিৎসা, বিশ্রাম, নিয়োগপত্র), হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা, সরকারি খরচে গৃহশ্রমিকদের মামলা পরিচালনা করা, ফৌজদারি আইনকে অবজ্ঞা করে আপোষ মীমাংসা করতে না দেয়া এবং প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মামলাসমূহের অগ্রগতি মনিটর করা, 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১০' দ্রুত অনুমোদন ও অবিলম্বে গেজেট প্রকাশ করা এবং 'গৃহ শ্রমিকের জন্য শোভন কাজ' শীর্ষক আইএলও কনভেনশন প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকাসহ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা।

গৃহ শ্রমিক সুরক্ষায় আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে গৃহ শ্রমিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কেও গৃহ শ্রমিক সুরক্ষায় আইন হয়েছে। গৃহ শ্রমিকের অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশে অবিলম্বে আইন প্রণয়ন জরুরি।

গৃহ শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩০টি সংগঠন (জাতীয় শ্রমিক সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠন) সমন্বয়ে ২০০৬ সালে 'গৃহ শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক' গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স) গৃহ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এবং এই নেটওয়ার্কের সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। নেটওয়ার্কের উদ্যোগে গৃহ শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় আচরণবিধি প্রণয়নের জন্য ২০০৮ সালে সরকারের কাছে প্রস্তাবনা দেয়া হয় এবং এর ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং নেটওয়ার্কের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা - ২০১০'- এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত নীতিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি।

নীতিমালাটি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের নিবন্ধন, কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদানসহ আমাদের সংবিধানে সমঅধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই নীতিমালায় নিয়োগকারীর দায়িত্ব, সরকারের দায়িত্ব, গৃহ শ্রমিকদের দায়িত্ব পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নীতিমালার শেষ ভাগে কিছু বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নীতিমালার উলেল্লখযোগ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে গৃহ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন, নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, নিবন্ধন ব্যবস্থা, মজুরি, কর্মঘণ্টা, ছুটি ও বিশ্রাম বিষয়ে বিধান, গর্ভকালীন ও প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদান, গৃহ শ্রমিকদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদান, নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা।

দেশের অভ্যন্তরে গৃহ শ্রমিক নির্যাতনের পাশাপাশি বাংলাদেশের নাগরিকরা যারা দেশের বাইরে নানান নির্যাতনের শিকার হয় তাদের সুরক্ষায় আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রয়োজন। এ বছর জুনে জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য আইএলও'র সম্মেলনে 'গৃহ শ্রমিকের জন্য শোভন কাজ' শীর্ষক একটি কনভেনশন গৃহীত হয়েছে। গত বছর ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'গৃহ্‌শ্রমিকের জন্য শোভন কাজ' বিষয়টি একটি এজেন্ডা হিসেবে

গৃহশ্রমিকদের জন্য সনদ পাস করল আইএলও

বিশ্বের প্রায় ৫ কোটি ২৬ লাখ গৃহ শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় গত ১৬ জুন ২০১১ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) একটি যুগান্তকারী সনদ পাস করেছে। নতুন সনদে গৃহ শ্রমিকদের অন্যান্য শ্রমিকের মতোই অধিকার দেয়া হয়েছে। এ সনদ অনুযায়ী গৃহ শ্রমিকদের সঙ্গে এখন থেকে লিখিত চুক্তি করতে হবে। এছাড়া সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে এবং বার্ষিক ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতে তাদের নিয়োগকারীর বাড়িতে থাকতে হবে না।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সরকারি প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের সংগঠন সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ সনদ অনুমোদনে ভোট দিয়েছে। এই সনদের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৯৬টি এবং বিপক্ষে পড়েছে ১৬টি। বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধিদল সেখানে উপস্থিত থেকে এই সনদের পক্ষে অনুমোদন দিয়েছে। এই কনভেনশন দেশে-বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের ২০ লক্ষাধিক গৃহ শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আইএলওর মহাপরিচালক হুয়ান সোমাভিয়া বলেছেন, 'আমরা আইএলওর অধিকার মানদণ্ডকে এই প্রথমবারের মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত করছি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এক প্রতিনিধি বলেছেন, আইএলওর জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করতে যাচ্ছি।

আইএলওর তথ্যানুযায়ী ২০১০ সালে সারা বিশ্বে গৃহ শ্রমিক ছিল কমপক্ষে ৫ কোটি ২৬ লাখ। বিভিন্ন দেশের জরিপ থেকে আইএলও এই তথ্য পেয়েছে। তবে সংস্থার মতে, প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি। কেননা অনেক দেশ সঠিকভাবে হিসাব করেনি।

যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশ এই সনদকে সমর্থন দিলেও যুক্তরাজ্য এর পক্ষে ভোট দেয়নি। দেশটি বলেছে, তারা ভোট দেয়নি, কারণ নিকট ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কেননা বাড়িতে বাড়িতে কর্মরত গৃহ শ্রমিকদের জন্য এতো নিরাপত্তা ও সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

গৃহীত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রস্তাব পাস হয়েছে। এই কনভেনশন পাস হলে গৃহ শ্রমিকদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক শ্রম মন্দণ্ড পাওয়া যাবে এবং আমাদের অভিবাসী গৃহ শ্রমিকসহ সকল গৃহ শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হবে। এই কনভেনশন গৃহীত হওয়া ও তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারসহ সকল পক্ষ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন গৃহ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আজ জাতীয়ভাবে দিনবদলের শে--াগান দেয়া হচ্ছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কথা বলা হচ্ছে। এই দিন বদল শুধু প্রযুক্তি উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, আমাদের মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নে নজর দিতে হবে। যে বাড়িতে কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার হয় সে বাড়িতে মধ্যযুগীয় কায়দায় গৃহ শ্রমিক নির্যাতিত হয়। দিনবদল ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এই বিপুল সংখ্যক গৃহ শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সবার আন্তরিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সা□য় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গৃহ শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষাসহ মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। অধীনস্ত বলে প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। গৃহ শ্রমিকের কাজের স্বীকৃতি অর্জনের জন্য সামাজিক মূল্যেবোধের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। গৃহ শ্রমকে আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে সক্ষম হলে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এসব বিবেচনায় গৃহ শ্রমের জন্য নীতিমালা ও আইনি বিধান শুধু জরুরি নয়, অত্যাবশ্যকও বটে।

গৃহ শ্রমিকের অধিকার বিষয়টি আমাদের রাজনীতি, শ্রমিক আন্দোলন কিংবা সামাজিক বা মানবাধিকার আন্দোলনে কখনোই খুব একটা প্রাধান্য পায়নি। অথচ গৃহ শ্রমিকেরা আমাদের সমাজ-সংসারে বহুকাল ধরে একাকার হয়ে আছে এবং এরা সংখ্যার বিচারেও বিরাট অংশ। দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি, শ্রমিক ও নারী আন্দোলন এবং মানবাধিকার আন্দোলনে এ বিষয়টির প্রতি গভীর মনোনিবেশ এখন সময়ের দাবি। দেশের এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকা ও মানবাধিকার নিশ্চিত কল্পে আইনি সুরক্ষার কোন বিকল্প নেই। ■

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, সামাজিক নিরাপত্তা ও জাতীয় বাজেট

মনোয়ার মোস্তফা*

প্রতি বছর জুন মাসে জাতীয় বাজেট ঘোষণা করা হয়। আমরা সকলেই জানি, আমলানির্ভর গতানুগতি ধারায় প্রণীত এ বাজেটে সাধারণ মানুষ, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। এমনকি বাজেট প্রণয়ন ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরও অংশগ্রহণের তেমন সুযোগ থাকে না। জাতীয় সংসদে কেবল সাংসদরা বাজেট আলোচনার সুযোগ পান। মাত্র দুই কিংবা আড়াই সপ্তাহের আলোচনার মাধ্যমে বাজেটের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না। সংসদসদস্যরাও যে বাজেটের ওপর গুণগত মানসম্পন্ন কোনো আলোচনা হাজির করতে পারেন তা নয়। ইদানীং অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে কিছু প্রাক-বাজেট আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এই আলোচনায় কেবল ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ও তাদের চেম্বারগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যেখানে শুল্ক-কর ইত্যাদি কমানো কিংবা বাড়ানো নিয়ে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকে। সরকারের উদ্যোগে বাজেট বিষয়ে শ্রমজীবী জনগণ কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার সুযোগ নেই বললেই চলে। সঙ্গত কারণেই বাজেটে জনস্বার্থ কিংবা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিতই থেকে যায়। এ কারণেই বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ বাজেটের আগেই তাদের দাবিগুলি তুলে ধরতে শুরু করে। এর কতটা সরকারি নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় তা হলপ করে বলা মুশকিল।

জনঅংশগ্রহণহীন এই বাজেট সব সময়ই দারিদ্র্য দূরীকরণের অঙ্গীকার নিয়ে প্রণীত হয়। বরাবরই সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন দলিলগুলোতেও (পিআরএসপি কিংবা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণকে এক নম্বর অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৫-৬ শতাংশ হলেও এই অগ্রগতি দারিদ্র্য দূরীকরণে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। বাংলাদেশে এখনো ৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে; প্রায় ৪ কোটি মানুষ অতি দরিদ্র। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকা নিরাপদ নয়। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা,

* স্বাধীন গবেষক

কাজের অনিশ্চয়তা তাদের নিত্যসঙ্গী। বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের এক বিপুল অংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করে। বাংলাদেশের সংবিধান, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা কিংবা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা'র নানা কনভেনশনে শ্রমজীবী মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হলেও এর মৌল চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো নীতি-কর্মসূচি লক্ষ্য করা যায় না। বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা জাল নামক কর্মসূচির আওতায় অতি দরিদ্র মানুষের জন্য একাধিক কর্মসূচি এবং বরাদ্দ লক্ষ্য করা যায়। প্রতি বছর এই নিরাপত্তা জাল খাতে বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এর ব্যাপ্তি এখনো সীমিত এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে কেবল দারিদ্র্য হটানোর লক্ষ্য সামনে রেখে সামাজিক নিরাপত্তা জাল-এর বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে।

বাজেট কেবল অর্থ বারদ্দের খতিয়ান নয়। বহুবিধ গাণিতিক হিসাব-নিকাশ সংবলিত খাতওয়ারি অর্থ বরাদ্দের একটি জটিল চিত্র এখানে দেখা গেলেও কার্যত অর্থনৈতিক এই দলিলের চরিত্রটি রাজনৈতিক। কেননা বাজেটে সামগ্রিক উন্নয়ন-অগ্রগমন সংক্রান্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোর প্রতিফলন থাকে। পলিসি ও কর্মকৌশল যা বাজেট বরাদ্দের ধরনকে প্রভাবিত করে, তা চরিত্রগতভাবেই রাজনৈতিক। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণাটি অবশ্যই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যা নীতি-কৌশল আকারে বাজেট বরাদ্দের ধারাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

বিশ্বায়ন ও নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক দর্শন সংবলিত নীতি-কৌশল বাংলাদেশের মতো অনেক দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর শ্রমজীবী মানুষের জীবনে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি করেছে। সরকারি খাত, সরকারি সেবাসমূহের সংকোচন দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকাকে নিরাপত্তাহীনতায় ঠেলে দিয়েছে। শ্রম নিয়োজনের ক্ষেত্র ও কাঠামোতে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাই শ্রম ও কর্মসংস্থানের আলোকে দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে বিশে-ষণ করে 'সামাজিক নিরাপত্তা' ব্যবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজোনোর তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। আসন্ন বাজেটে এর প্রতিফলন থাকা জরুরি।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত

সরকারি হিসেব (২০০৯) মতে, বাংলাদেশে ১৫ বছরের উপরে জনসংখ্যা হলো ৯ কোটি ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৩০ জন। এর ৫৬.২% অর্থাৎ ৫৩.৯ মিলিয়ন হলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী। সর্বশেষ হিসাব মতে দেশে বেকারত্বের হার শতকরা ৫.১ ভাগ এবং প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের হার শতকরা ২৮.৭ ভাগ। স্ব-কর্মসংস্থান (৪৬.৬৫%), দিনমজুরি (২০.১৭%) ও পারিবারিক কাজে (২১.২৩%) নিয়োজিত আছে মোট শ্রমশক্তির ৮৮.০৫%। মোটমুটিভাবে এদেরেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উলে-খ্য, বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক (সরকারি ও বেসরকারি) খাতে মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১৭.০৩ শতাংশ নিয়োজিত আছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত মূলত প্রচলিত স্থানীয় সম্পদের ওপর দাড়িয়ে গড়ে ওঠা স্বল্প বিনিয়োগের শ্রমঘন খাত। এখানে কাজের ধরন অস্থায়ী ও সাময়িক চরিত্রের। কোনো ধরনের নিয়োগ কিংবা পরিচয়পত্র ছাড়াই মানুষ এখানে কাজ করছে। বলা হয়ে থাকে, বর্তমান শ্রমবাজারে প্রতি পাঁচজন নতুন মুখের চারজনই ঠাঁই নিচ্ছেন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মজীবীদের বিরাট সংখ্যক হলো নারী। নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এই সেক্টরের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহুবিধ পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন এই নারীরা। এই খাতের আরেকটি উলে-খযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এখানকার শ্রমজীবীরা অসংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক খাতের সংগঠিতদের মতো দাবি আদায় বা দরকষাকষির সুযোগ এখানে নেই। সাধারণত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ বলতে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদেরই বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু দারিদ্র, বঞ্চনা ও অসহায়ত্বের নিরিখে এই খাতে নিয়োজিত মানুষই সবচেয়ে প্রান্তিক। গ্রামে কাজের সুযোগ কম থাকা, নদী ভাঙন, ভূমিহীনতা ইত্যাদি নানা কারণে শহরাঞ্চলে এই মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ছোটখাটো ব্যবসা, হকারি, দিনমজুরি, রিকশা চালনা, বাসা-বাড়িতে কাজ, সেলাইসহ হাজারো রকমের কাজ করছে কাজের খোজে শহরাঞ্চলে ছুটে আসা এই শ্রমজীবীরা। এদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা তথা সামাজিক সুরক্ষার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

বিভিন্ন নীতি ও কর্মকৌশল বাজেট বরাদ্দের ধরনকে প্রভাবিত করে এবং তা চরিত্রগতভাবেই রাজনৈতিক। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণাটি অবশ্যই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যা নীতি-কৌশল আকারে বাজেট বরাদ্দের ধারাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক ধারণা

সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি ব্যাপক- এর আওতা-পরিধি অনেক বড়। এর সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার মতো বিষয়গুলোও জড়িত। একই সাথে এটি 'অধিকার'- এর প্রশ্নও বটে। সামাজিক নিরাপত্তা মূলত একটি বীমাভিত্তিক ব্যবস্থা, যেখানে অনেক মানুষের ঝুঁকি একত্র করা হয় এবং দুঃসময়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকেই কিছু অবদান রাখে। এটা কোনো দান বা ভিক্ষা নয়। অর্থনীতিকে রক্ষা ও গতিশীল করা এবং সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য 'সামাজিক নিরাপত্তা' ব্যবস্থা চালু করা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে এই অধিকারের কথা বলা হয়েছে- 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার'। অন্যদিকে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২৫ ধারায় বলা হয়েছে, 'নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য কল্যাণের জন্য যথাযথ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কাজের সুবিধা লাভের অধিকারও এ সঙ্গে প্রত্যেকেরই প্রাপ্য। বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবনযাপনে ভিন্ন কোন বিপর্যয়ের

ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভও এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।' ২০০৮ সালে ভারতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য Unorganized Workers Social Security Bill, 2008 নামে একটি আইন পাস করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় আগামী ৫ বছরে ৩৪ কোটি শ্রমিককে স্বাস্থ্য, জীবন ও প্রতিবন্ধকতা বীমা, পেনশন এবং দলগত দুর্ঘটনা স্কিমের আওতায় আনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটিকে বৃহত্তর আঙ্গিকে বিবেচনায় নিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-কাঠোমো তৈরি ও আইনি উদ্যোগ নিতে পারে।

বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা জাল ও অতি দরিদ্র মানুষ

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কিছু সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এর বেশির ভাগই আবার সরকারি খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বেসরকারি খাতে এর ব্যাপ্তি কতটা তা স্পষ্ট করে জানা যায় না। তবে বেসরকরি খাতের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র গার্মেন্ট সেক্টরের কথা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা বেসরকারি খাতে কোনমতেই আশাব্যঞ্জক নয়। সরকার নীতিগতভাবে এ খাতকে সেভাবে বিবেচনায়ও নেয় না। সাধারণভাবে সরকার দারিদ্র্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় সামাজিক নিরাপত্তা জাল নামে কিছু সামাজিক সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশে বর্তমানে ৮৪ ধরনের নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি চালু রয়েছে যা কমপক্ষে ১৫ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর আওতায় রয়েছে মাত্র শতকরা ১৩.১ ভাগ পরিবার। অথচ দেশে অতি-দরিদ্রের হার শতকরা ১৫.১ ভাগ। এসব কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ঊর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। গত পাঁচ বছরে এই বরাদ্দ মোট বাজেটের ৮-১৫ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে যা জিডিপি'র ০.৮ থেকে ২.৫ শতাংশের মতো। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, এই হার ২০১৫ সালের মধ্যে জিডিপি'র শতকরা ৩ ভাগে নেয়া হবে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে এই হার শতকরা গড়ে ৪, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুরিতে ৮ এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে ২০ ভাগ।

সামাজিক নিরাপত্তা জাল : প্রধান প্রধান কয়েকটি কর্মসূচি

এসব নিরাপত্তা জাল কর্মসূচির আওতাই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, এগুলো অতি মাত্রায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রণীত। নগর দারিদ্র্য লাঘবের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যাপক দুর্নীতি ও সম্পদের অপচয় ঘটে। রাজনৈতিকভাবে এই কর্মসূচিগুলো অতি মাত্রায় জনপ্রিয়। কেননা এর ভেতর দিয়ে ক্ষমতাসীন দল একটি শক্তিশালী নির্ভরশীল ক্লায়েন্ট সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অঞ্চল ভেদে এর বরাদ্দ ও বাস্তবায়নগত পার্থক্যও চোখে পড়ে। দুঃখজনক সত্য হলো, এসব কর্মসূচির বাস্তবায়নে একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত থাকা ও সমন্বয়হীনতার কারণে কত মানুষ বা পরিবার কি কি কর্মসূচির সুবিধা কিভাবে ও কতটুকু পাচ্ছে তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যন নেই।

সামাজিক নিরাপত্তা : চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন আঙ্গিকে ভাবনা

আমরা আশা করবো, বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষা ও ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি-কাঠামোর রূপরেখা প্রণয়ন করবে। বিচ্ছিন্ন একাধিক কর্মসূচি ও একাধিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেবল সম্পদের অপচয় ঘটায়। সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে দান-অনুদান বা সরকারি সাহায্য ধারণার বিপরীতে অধিকারভিত্তিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। Overlapping এবং দুর্নীতি-অপচয় কমানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এসব কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের পরিবারভিত্তিক একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের এসব কর্মসূচিতে অন্ত র্ভুক্ত করতে হবে। তাছাড়া এ খাতের শ্রমজীবীদের সমবায়ধর্মী উদ্যোগগুলোকে উৎসাহ প্রদান করে এসব সমবায়ী উদ্যোগের সাথে সরকারি সহায়তা কিভাবে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। ■

সামাজিক নিরাপত্তা জাল : প্রধান প্রধান কয়েকটি কর্মসূচি

ধরন	কর্মসূচি
কর্মসৃজন	• অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসৃজন (ইজিএইচপি) • জাতীয় সেবা প্রদান • গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংরক্ষণ • কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এফএফডবি-উ) • ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) • টেস্ট রিলিফ (টিআর)
শর্ত সাপেক্ষ হস্তান্তর	• প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান • প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্য কর্মসূচি
হস্তান্তর	• বয়স্ক ভাতা • দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা • দুস্থ ভাতা
দুর্যোগকালীন ত্রাণ	• দুস্থদের জন্য খাদ্য কর্মসূচি (ভিজিএফ) • খোলাবাজারে বিক্রি (ওএমএস)

তথ্য সূত্রঃ

আলতাফ পারভেজ (২০০৮), 'রাষ্ট্র, উদারীকরণ ও শ্রমজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তা: বিপদের মুখে বাংলাদেশ', পাওয়া, ঢাকা।

ড. ফারজানা ইসলাম, জাকির হোসেন এবং অমিত রঞ্জন দে (২০০৯), 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও শ্রমজীবী মানুষ' (সংকলন), পার্টনারশিপ অব উইমেন ইন একশন ও নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

BBS (2010), 'Report on monitoring of employment survey- 2009', Dhaka.

BBS (2010), 'Report on welfare monitoring survey- 2009': Dhaka.

BBS (2008), 'Report on labor force survey- 2005-06', Dhaka.

সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন প্রেৰিত আড়িয়ল বিল

এমএম কবীর মামুন*

১৯৭১ সালের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা বাংলাদেশ অর্জন করেছিল তা হাটি হাটি পা পা করে আজ ৪০ বছরে পা দিয়েছে। স্বাধীনতার পর কয়েক দফা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশ গণতন্ত্র চর্চার প্রাথমিক ধাপে পা দিয়েছিল ১৯৯১ সালের প্রথম দিকে। তাও সেটা হয়েছিল ২০ বছর আগে। এই দীর্ঘ ২০ বছরের গণতান্ত্রিক চর্চার ধারায় রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বহু আলোচিত-সমালোচিত অর্জন ব্যর্থতা রয়েছে। এই সময়ে মানুষ নির্বাচনী সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠলেও তা সাধারণ মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি ও মানে খুব বেশি পরিবর্তন এনে দিতে পারেনি। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসার অল্প সময়ের মধ্যে তারা হয়ে পড়ে জনবিচ্ছিন্ন। তারা শুধু দলীয় এবং দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জনগণের মতামতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন অথবা গুরুত্ব দেয়ার কথা তারা বেমালুম ভুলে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে তারা হয়ে পড়ে জনবিচ্ছিন্ন। এছাড়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ঔপনিবেশিক ধাঁচের পাশাপাশি প্রশাসনের সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের মনোজগতের উপনিবেশিকতা তাদের আমলাতান্ত্রিক আচরণে বাধ্য করছে। ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে'– এ রকম বলা থাকলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গড়ে ওঠা আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা জনঅংশগ্রহণের পরিবর্তে তৈরি করছে জনবিচ্ছিন্নতা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত প্রায় ডজনখানেক আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদ অনুস্বাক্ষর তথা অনুমোদন করেছে; উপরন্তু রয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান যা রাষ্ট্রের মানবাধিকার ও সুশাসনের আইনগত ভিত্তি। এরপরও গত ৪০ বছরে দেশে সুশাসন ও মানবাধিকারের সংকটগুলো বার বারই সামনে চলে এসেছে। তাই সাধারণ মানুষকেই এ সকল সংকট উত্তরণের পথ খুঁজতে হয়েছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে নানান সামাজিক উদ্যোগ। এ সকল সামাজিক উদ্যোগকে সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন বলে উলেৰখ করা যেতে পারে। এ সকল আন্দোলন আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পাশাপাশি চেতনাগত উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। যে সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়েছে, মানুষ শিকার হয়েছে নিপীড়ন, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার সেখানেই মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। স্থানীয়ভাবে জন্ম নেয়া এসব সামাজিক উদ্যোগে মানুষ সংগঠিত হয়েছে। সংগ্রাম করেছে অধিকার আদায়ের। এ অধিকার আদায়ের সংগ্রামগুলো বা সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর মধ্যে যেগুলোর নাম উলেৰখ করা যায় তা হলো– মধুপুরের ইকো পার্ক বিরোধী আন্দোলন, জাহাঙ্গীরনগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন, কানসাটের বিদ্যুতের জন্য আন্দোলন, দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন বিরোধী আন্দোলন, ঢাকার বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনের পাশাপাশি সম্প্রতি সংঘটিত আড়িয়ল বিল রক্ষা আন্দোলন। বর্তমান নিবন্ধে সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে আড়িয়ল বিল রক্ষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার প্রতি আলোকপাত করা হবে।

এ বছরেরই প্রথম দিকে (জানুয়ারি ২০১১) এক রকম হঠাৎ করেই আড়িয়ল বিল এলাকায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নামে ৫০ হাজার কোটি টাকার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও স্যাটেলাইট শহর নির্মাণের ঘোষণা দেয় সরকার। কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব, সমীক্ষা ও বিলনির্ভর মানুষের জীবন, জীবিকা, অস্তিত্বের কথা বিবেচনা না করেই সরকার মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও সিরাজদীখান এবং ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলাকে ঘিরে প্রায় ২৫ হাজার একর এলাকাজুড়ে এ বিমান বন্দর ও স্যাটেলাইট শহর নির্মাণের ঘোষণা হয়। জনগণের স্বার্থ ও মতামতের মূল্যায়ন না করে রাষ্ট্র স্বার্থের কথা বলে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ)–'র কথা বলে এই ঘোষণা দেয় সরকার। এই ঘোষণা আড়িয়ল বিলের সাথে সম্পৃক্ত লক্ষ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। গঠিত হয় আড়িয়ল বিল রক্ষা কমিটি। স্থানে স্থানে অস্থায়ী ক্যাম্প গঠনের

লেখক: কর্মসূচি কর্মকর্তা, নাগরিক উদ্যোগ

মধ্য দিয়ে শুরব হয় প্রতিরোধ আন্দোলন। নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে, জীবন রক্ষার তাগিদে মানুষ যুক্ত হয় এই আন্দোলনে। কিন্তু কেন সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে যুক্ত হলো তা একটু খতিয়ে দেখাটা প্রয়োজন। স্থানীয় ও বহিরাগত মিলিয়ে প্রায় ১১ লাখ মানুষের জীবিকার উৎস হলো এই আড়িয়ল বিল। এই উৎসের মধ্যে রয়েছে বিলের কৃষি ও মৎস সম্পদ। এই কৃষি ও মৎস সম্পদের কিছু ধারণা এখানে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

আড়িয়ল বিলের কৃষি

আড়িয়ল বিলের আশপাশের মানুষ প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জমিগুলো দোফসলি এবং প্রচুর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন। ২৫ হাজার একর জমির কৃষির সাথে এলাকার ৮০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এই বিলের ভূমিতে একর প্রতি প্রায় ১০০-১১০ মণ ধান উৎপাদিত হয় যা উঁচু এলাকার দুই ফসলেও হয় না। আড়িয়ল বিল এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে যুগ যুগ ধরে। বংশপরম্পরায় ভাগাভাগির কারণে এখানে বড় আকারের ভূস্বামীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিলের আশপাশের প্রায় ৭ শতাংশ মানুষের নিজস্ব জমি আছে আর প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন। তাহলে দেখা যাচ্ছে নিজস্ব জমির পাশাপাশি অধিকাংশ ভূমিহীন মানুষ এখানে কৃষি দিনমজুরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। আর এই কৃষি দিনমজুরির মূল কেন্দ্র হলো আড়িয়ল বিলের কৃষি।

আড়িয়ল বিলের মৎস সম্পদ

আড়িয়ল বিলে রয়েছে অসংখ্য মাছের পুকুর। স্থানীয়ভাবে এগুলোকে বলা হয় ডেঙ্গা। প্রায় দুই লক্ষাধিক মানুষ এই ডেঙ্গার মাছ উৎপাদন, বিপণন ও ধরার কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এলাকার ভূমিহীন মানুষগুলোর আয়ের উৎস হলো এই মাছ। শুধুমাত্র এলাকারই নয় উত্তরবঙ্গের শত শত মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয় এই মাছ উৎপাদন, মাছ ধরা ও বিপননের মাধ্যমে। সারা বছর এই আড়িয়ল বিল থেকে ঢাকাসহ আশপাশের জেলায় মাছ সরবরাহ করা হয়। উলেৱখ্য, ঢাকায় সরবরাহকৃত মাছের ৮০ শতাংশই আসে এই বিল থেকে। তাই স্থানীয় মানুষ এই বিলকে স্বর্ণগর্ভাও বলে থাকেন।

এছাড়া বর্ষাকালে শাপলা বি□ করে এখানকার গরিব মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। সে সময় লাখ লাখ টাকার শামুক সংগ্রহ করে চিংড়ি ঘেরে বি□ করা হয়। তাছাড়া শুকনো মৌসুমে পেঁয়াজ, রসুন, সরিষাসহ নানান রবিশস্য উৎপাদিত হয়। ঢাকার নয়াবজারের যে বড় লাউমিষ্টি কুমড়া বি□ হয় তাও সেই আড়িয়ল বিলেরই ফসল।

এত অর্থনৈতিক নির্ভরতা যে বিলের ওপর, তার কোনো গবেষণা প্রতিবেদন বা প্রমাণপত্র ছাড়াই সরকার বন্ধ্যা, অনাবাদী, পতিত জমি আখ্যা দিয়ে স্যাটেলাইট শহর এবং আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণের ঘোষণা দেয়। ফলে এই বিলের ওপর যাদের নির্ভরতা, এখানে যারা জীবিকা নির্বাহ করে সেই মানুষ নিজেদের জীবনের প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে– এটাই স্বাভাবিক।

জীবন মানের উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন এবং নগরায়ন অবশ্যই প্রয়োজন, তবে তা করতে গিয়ে যদি প্রায় ১০ লক্ষাধিক মানুষ ভিটেমাটি হারায়, প্রতিবেশ যদি হয় হুমকির সম্মুখীন তাহলে সেই নগরায়ন বা শিল্পায়নকে উন্নয়ন হিসেবে কীভাবে অভিহিত করা যায় তা অবশ্যই প্রশ্নের দাবি রাখে। আড়িয়ল বিলে স্যাটেলাইট শহর এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর না করার পেছনে যে অসংখ্য যুক্তি রয়েছে তার কারণেই সেখানকার মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। জনতার প্রতিরোধের মুখে সরকার আপাতত পিছু হটলো। আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর না করার ঘোষণা দিল। কিছু মানুষের নামে মামলা থেকেই গেল। কিন্তু এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ আসলে কি? মানুষের প্রতিরোধের একটা তাৎক্ষণিক ফল আমরা এখানে দেখতে পেলাম, আপাতত বিলে শহর ও বিমানবন্দর নির্মাণ বন্ধ হলো। কিন্তু এর কি কোনো দীর্ঘ মেয়াদি ফল আমরা দেখতে পাই?

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের অন্যায় মেনে না নেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে আধুনিক যুগে এসে প্রতিরোধের ধরন বদলাতে শুরব করে। অধিকার রক্ষায় মানুষ বারবারই রাষ্ট্রের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করে এসেছে। প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের অথবা রূপান্তরের চেষ্টা এক ধরনের নতুন জাগরণ। একে অনেক গবেষক নব্য জাতীয়তাবাদ বা নিউ ন্যাশনালিজম বলে উলেৱখ করেন। এই নব্য জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধের ঘরানা বাংলাদেশে মানবাধিকার

জীবনমানের উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন এবং নগরায়ন অবশ্যই প্রয়োজন। তবে তা করতে গিয়ে যদি প্রায় ১০ লৰাধিক মানুষ ভিটেমাটি হারায়, প্রতিবেশ যদি হয় হুমকির সম্মুখীন তাহলে সেই নগরায়ন বা শিল্পায়নকে উন্নয়ন হিসেবে কীভাবে অভিহিত করা যায় তা অবশ্যই প্রশ্নের দাবি রাখে।

ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সময়ে অনেক পরিচিত একটি ধারা। এ ধারাটি সাধারণ মানুষের চেতনাগত সংস্কৃতির পরিবর্তনে ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

আমরা দেখতে পাই, এই সময়ে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষ সংগঠিত হতে এবং আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে '৯০- এর গণআন্দোলনের কথা যদি আমরা দেখি এই গণ আন্দোলন বাংলাদেশে দীর্ঘ সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী সংস্কৃতি নিয়ে আসে। এর মাধ্যমে দেশ গণতন্ত্রের পথে হাটতে শুরব করে। আবার যদি ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা সংগ্রামের কথা ধরি তাহলে দেখতে পাই, লাখ মানুষ সেখানে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে সরকার তার সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়নে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সেনাবাহিনীর জন্য বিলাসবহুল ফ্ল্যাট নির্মাণ করতে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত রবখে দিয়েছে এবং সম্প্রতি আড়িয়ল বিল রক্ষা আন্দোলনেও আমরা প্রায় একই রকম চিত্র দেখতে পাই।

আড়িয়ল বিল রক্ষা আন্দোলনের মতো সংগঠিত অসংখ্য সমাজিক উদ্যোগ এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং এক উন্নত মানবাধিকার সংস্কৃতি নিশ্চিত করার ইঙ্গিত বহন করছে– এটা অনুমান করা যায়। আড়িয়ল বিল রক্ষা আন্দোলন বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে নিঃসন্দেহে একটি বড় চাপ। ■

পোশাক শিল্পে নারীর যুক্ততা মতাদর্শিক নির্মাণ

রাবেয়া খাতুন*

শ্রমবাজারে নারীর সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের নারী সমাজে প্রান্তিক অবস্থান দখলকারী নারীরা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে (Formal Sector) শ্রমদান প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হয় মূলত আশির দশকে পোশাক শিল্প-কারখানা অধিক হারে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আগে এই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নারীরা দিনমজুর হিসেবে কিংবা বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক (Informal) শ্রমদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আমার লেখায় মূলত পোষাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকের জীবনের আর্থসামাজিক অবস্থা, সমাজে তার কি ধরনের প্রতিচ্ছবি নির্মিত হয় এবং এই প্রতিচ্ছবি নির্মাণের পেছনে তার ভূমিকা কতটা ক্রিয়াশীল তা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও গৃহস্থালী বা পরিবারে গৃহী নারীর তুলনায় শ্রমজীবী নারী, কতটা ভিন্ন ভূমিকা পালন করেন, কিংবা আদৌ 'গৃহী' নারীর চেয়ে তার ভিন্নতা রয়েছে কিনা তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। এছাড়া, নারীর প্রাপ্ত মজুরি কতটা তার সিদ্ধান্তে ব্যয় হয়, পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কতটুকু তা আলোচনায় আনার চেষ্টা করেছি।

মজুরিবৈষম্য ও দক্ষতার নির্মাণ

পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থা শ্রমিককে শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতার দোহাই দিয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে বাধ্য করে যেখানে নারী সব দায়ভার নিয়ে সবচেয়ে 'সস্তা' ও 'বিছিন্ন' শ্রমিকে পরিণত হয়ে যান। ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে থাকে বিরাট মজুরি বৈষম্য। তবে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশের ধারণা তাদের মধ্যে কোনো মজুরি বৈষম্য নেই। 'যে দক্ষ সেই বেশি মজুরি পায়' এ ধরনের একটি ধারণা তাদের মধ্যে কাজ করে (মাঠকর্ম, ২০০৬)। প্রকৃতপক্ষে এই 'দক্ষতা' একটি নির্মাণ। কারণ পোশাক কারখানায় শ্রমিকের দক্ষতা বা তাদের উৎপাদিকা শক্তি বা তাদের দক্ষতার পরিমাপের সঠিক নির্ণয় প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কেননা একজন শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে কয়টি পোষাক তৈরি করতে পারে তাই হচ্ছে তার উৎপাদিকা শক্তি। পোশাক কারখানায় এই ধরনের তথ্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন যেহেতু পোশাক তৈরির কাজ হচ্ছে দলীয় কাজ। তাছাড়া কারখানাগুলোতে যে ধরনের পোশাক তৈরি হচ্ছে তাতে প্রয়োজন হচ্ছে ভিন্ন দক্ষতার। ফলে উৎপাদিকা শক্তি একে অন্যের সাথে তুলনীয় হবে না। যেমন– পোশাক কারখানার পুরো কাজ ৩ ভাগে ভাগ করলে দেখা যায় কাটিং, সোয়িং এবং ফিনিশিং। এ তিনটি বিভাগের মধ্যে নারীরা সবচেয়ে বেশি কাজ করে সুয়িং বিভাগে যেখানে বেতন সবচেয়ে কম। কাটিং এবং ফিনিশিং বিভাগে নারীর সংখ্যা কম এ বিষয়ে প্রশ্নের শ্রমিকদের ধারণা, কাটিং কষ্টের কাজ তাই মেয়েরা পারে না। ফিনিশিং এর ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হলো, মেয়েরা এত সূক্ষ্ম কাজ পারে না। তারপরও মজুরিবৈষম্যের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের নির্বিকার থাকার কারণ নারীর মনোজগতই তৈরি হয়েছে এমন ভাবে যে, নারীরা কষ্টসাধ্য এবং সূক্ষ্ম কাজ পারবেন না আর এ ধারণাটি মালিক শ্রেণী অধিপতি অত্যন্ত সুকৌশলে হেজেমনিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করিয়েছে নারীর মনোজগতে। নারী শ্রমিকরা পুরুষদের চেয়ে অদক্ষ এ কথা জেনেও কেন নারী শ্রমিকদের পোশাক কারখানায় নিয়োগ দেয়া হয় এ প্রশ্নের উত্তরে মালিক পক্ষের একজন জানান নারীরা সাধারণত অনুগত হন এবং কারখানার যে বদ্ধ পরিবেশ সেখানে পুরুষ শ্রমিককে অধিকক্ষণ আটকে রাখা যায় না। যেকোনো অজুহাতে কিছুক্ষণ পর পরই তারা বাইরে যেতে চায়। ফলে সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া নারীরা আন্দোলন, মিছিল প্রভৃতিতেও খুব বেশি জড়ান না (তথ্যসূত্র : মাঠকর্ম,২০০৬)।

শ্রমিক নারীর প্রতিচ্ছবি নির্মাণ

পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রতিচিত্র বা প্রতিচ্ছবি নির্মিত হয়ে থাকে। যে গ্রাম থেকে নারীটি শহরে আসে সে গ্রামের মানুষ যেমন এই প্রতিচিত্র বা প্রতিচ্ছবি তৈরি করে তেমনি শহরের মানুষও। কারণ তৈরি পোশাক শিল্পে বেশির ভাগ নারীই অল্প বয়সী, অবিবাহিতা। অধিকাংশই একা শহরে আসে। এর পেছনেও থাকে সংসার ভেঙে যাওয়া কিংবা বাবা-ভাইদের কাছে আশ্রয় না পাওয়ার কারণ।

তারা পুরুষ অভিভাবকত্বের বাইরে থাকার কারণে 'উদার' নগর সমাজেও নিরন্তর সন্দেহের মুখে পড়েন। নগরে একা আসা, একা থাকতে চাওয়া, একা থাকতে বাধ্য

* স্বাধীন গবেষক

হওয়া যাই হোক না কেন প্রথাগত গৃহস্থালির বাইরে এসে যাওয়ায় সাংস্কৃতিক চুক্তি ভাঙার দায়ে প্রতিনিয়তই সামাজিক অনুশাসনে পড়তে হয়।

পোশাক কারখানায় কাজ করতে গেলে সময়ের সাথে তাল মেলানো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু তাদের ঘড়ি পরা যেমন 'ফ্যাশন করা' (নেতিবাচক অর্থে) হিসেবে দেখা হয় তেমনি মোবাইল ফোন ব্যবহার করাও একই মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। মোবাইল ফোন ব্যবহার প্রসঙ্গে তাদেরও ধারণা মোবাইল ফোন থাকলে মানুষ খারাপ বলে। বাড়ির সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য এটি তার প্রয়োজনীয় হলেও তিনি এই নেতিবাচক ইমেজের আওতায় পড়তে চান না। পোশাক শিল্পে কর্মরত এই নারীদের প্রয়োজনও স্বীকার করা হয় না। এ প্রসঙ্গে আমার এক প্রতিবেশীর বক্তব্য, 'আর মোবাইল ব্যবহার করব না; গার্মেন্টের মেয়েদের হাতেও আজকাল মোবাইল ফোন' কিংবা পহেলা বৈশাখে যখন এই শ্রমজীবী নারীরা বাঙালির আবহমান সাংস্কৃতিক উৎসব পহেলা বৈশাখ পালন করার জন্য অন্য সবার সাথে পথে নামেন তখন এ প্রসঙ্গে আমার এক আত্মীয় মন্তব্য করেন, 'গার্মেন্টের মেয়েদের জন্য পহেলা বৈশাখে ঢাকার রাস্তায় বেরই হওয়া যায় না।'

পোশাক শিল্পে যুক্ত অধিকাংশ নারী শ্রমিক পুরুষ অভিভাবকত্বের বাইরে থাকার কারণে 'উদার' নগর সমাজেও নিরন্তর সন্দেহের মুখে পড়েন। নগরে একা আসা, একা থাকতে চাওয়া, একা থাকতে বাধ্য হওয়া– যাই হোক না কেন প্রথাগত গৃহস্থালির বাইরে এসে যাওয়ায় সাংস্কৃতিক চুক্তি ভাঙার দায়ে প্রতিনিয়তই সামাজিক অনুশাসনে পড়তে হয়।

পরিবার ও গৃহস্থালিতে শ্রমজীবী নারীর ভূমিকা

নারীর অধস্তনতার ক্ষেত্রে প্রচলিত সাধারণ ঘর-বাইরের (Private/Public) বিভাজন ছাড়াও ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নারীর অধস্তনতা ক্রিয়াশীল থাকে। এ বিষয়গুলোই বাংলাদেশে নারীদের অধস্তন মতাদর্শ টিকিয়ে রাখার পেছনে কাজ করছে সংগঠিতরূপে (কবির, নায়লা-৮৬)। তৃতীয় বিশ্বের শহুরে প্রেক্ষাপটে আর্থিক চাপের ফলে নারীরা যে শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে এই বাস্তবতায় নারীদের অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। গৃহস্থালির পুরুষ সদস্যটিকে পরিবারের খাদ্যের প্রধান যোগানদাতা মনে করার মতাদর্শ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্রিয়াশীল। পুঁজিবাদী সমাজে লিঙ্গীয় সম্পর্ক নির্মাণের ফলে নারীর শ্রমবাজারে যুক্ত হওয়া বা না হওয়া নারীর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন করে না। কারণ এটি মতাদর্শিক। গার্হস্থ্য ব্যবস্থা শুধু কাজই সুনির্দিষ্ট করে দেয় না, বরং নারী ও পুরুষ কি ধরনের মূল্যবোধ ধারণ করবে এবং কীভাবে নিজেদের প্রকল্প করবে তাও নির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ একজন শ্রমজীবী নারী কারখানায় নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টা ও তার অতিরিক্ত শ্রমঘণ্টা কাজে নিয়োজিত থেকেও বাড়িতে এসে গৃহস্থালির কাজগুলো সম্পাদন করেন। কিন্তু এই ঘরের কাজগুলো স্বীকৃতিহীন হিসেবেই রয়ে যায়। ঘরেবাইরে উভয় স্থানে শ্রম দিলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা হয় পরিবারে খুবই গৌণ। প্রবল আধিপত্যশীল পুরুষ কণ্ঠের চাপে তার সিদ্ধান্তটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং নারী পুরুষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই কাজ করলেও ঘরে ফিরেও গৃহস্থালির সকল কাজ নারী একাই করেন এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ও একইভাবে রান্না ও ঘরকন্নার সমস্ত কাজ নারী একাই করেন। ক্লান্তির কথা তার মনেও আসে না, বরং পুরোটা সময় সংসারে দিতে পারছেন না বলে সে সর্বদাই অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। ফলে ছুটির দিনে স্বামী কিংবা সংসারের পুরুষ সদস্যটি যখন গ্রামে তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে যায় কিংবা অবসরে হলে গিয়ে সিনেমা দেখে সেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা ঘরের কাজগুলো করে যেগুলো তিনি তার সপ্তাহের বাকিদিনগুলোতে কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে করতে পারেন না (তথ্যসূত্র : মাঠকর্ম, ২০০৬)।

প্রাপ্ত মজুরিতে প্রবেশাধিকার

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারী তার উপার্জিত অর্থ স্বামীর হাতে কিংবা সংসারের পুরুষ প্রধানের হাতে তুলে দেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় নারী তার উপার্জিত অংশের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এটি হয়তো নারী পরিবারেই তার সন্তান, ভাই কিংবা অন্য সদস্যদের জন্য ব্যয় করেন। নিজের জন্য ব্যয় করাকে নারীরা অপরাধ বলে মনে করেন (তথ্যসূত্র : মাঠকর্ম, ২০০৬)।

আমার গবেষণা থেকে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, আর্থিক আয় থাকলেই নারীর স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে– এমনটি বলা সমস্যাজনক। সাধারণীকরণ করে বলা যায়, আর্থিক উন্নতি কোনোভাবেই নারী আত্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। সিদ্ধান্ত গ্রহণে কে কি ভূমিকা রাখছেন, নারীর অর্জিত আয় কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, অসমতা বুঝতে হলে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। পোশাক কারখানায় কাজ করার ফলে লিঙ্গীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীদেরও তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি, যা কারখানার ভেতরের বৈষম্য দূর করতে পারে। আবার উৎপাদনে অংশগ্রহণ করা কিংবা অর্থ উপার্জন করার অর্থ এই নয় যে, নারীরা তাদের শ্রমের এই ফল ভোগ করছেন বা এর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছেন। ■

বৃত্ত ও বৃত্তান্ত

প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ-১১

স্থানীয় সরকার হলো গণতন্ত্রের ভিত্তি, যদি এটি ব্যর্থ হয়, গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।
রবার্ট ডবিল্বউ ফ্ল্যাক, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রায় দেড়শ' বছর আগে রাজস্ব আদায় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতার স্বপ্ন নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরব হয়েছিল সেটি আজ মহীরবহ। কালের পরি□মায় নানান ধাপ পেরিয়ে আধুনিক অবয়ব লাভ করেছে যে প্রতিষ্ঠানটি তার পেছনে জড়িয়ে আছে অনেক চিন্তাশীল লেখক গবেষকদের মূল্যবান মেধা ও শ্রম। তাদের এই অধ্যবসায় এবং ভালবাসা এগিয়ে চলার পাথেয় হয়েছে। এমনি একজন ব্যক্তিত্ব ড. তোফায়েল আহমেদ। 'বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় শাসন, রাজনীতি ও উন্নয়ন ভাবনা' নিয়ে তিনি কাজ করছেন অনেক কাল। এরই ধারাবাহিকতার ফসল 'বৃত্ত ও বৃত্তান্ত' বিষয়ক প্রকাশনা। এটি স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় উন্নয়নে আগ্রহীদেরও জন্য একটি প্রামাণ্য দলিল। এই বইয়ের শুরুতেই তিনি বলেছেন, ব্যক্তি ও বৃত্তের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কারণে ব্যক্তির বৃত্তহীনতা কিছুটা অকল্পনীয়। সে বৃত্ত নিজের তৈরিকৃত বা সামাজিকভাবে আরোপিত অথবা দুয়ের সম্মিলিত বিনির্মাণ যে কোনোটিই হতে পারে। ব্যক্তির যেমন বৃত্ত থাকে তেমনি থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় শাসন এবং স্থানীয় উন্নয়ন প্রা□িয়ায় এক ধরনের বৃত্ত ভাঙ্গার সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রামে আমরা নানাভাবে সম্পৃক্ত। এই প্রকাশনাটি সেসব চিন্তা এবং কর্মপরি□মার ফসল।

এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে ১৫টি প্রবন্ধ স্থানীয় সরকার বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনা হিসেবে গণ্য হতে পারে। এই রচনাগুলো মূলত কেন্দ্রীভূত হয়েছে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় শাসনের আলোচনাকে কেন্দ্র করে।

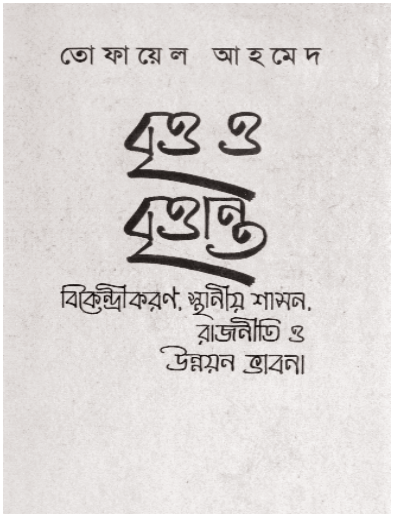

স্থানীয় অর্থনীতির পুনর্জাগরণে বিভিন্ন অনুঘটকের ভূমিকায় তিনি স্থানীয় অর্থনীতি এবং এটির বিকাশে বিকেন্দ্রীকরণের ওপর বিশেষ গুরবত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'অর্থনীতি কখনো ভৌগোলিক অবস্থান নিরপেক্ষ একক ও বিচ্ছিন্ন কিছু নিছক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি নয় এবং কর্মকাণ্ডের বিশেল্বষণে ভৌগোলিক অবস্থান বা স্থান এবং ঐ বিশেষ এলাকার গণমানুষেরও একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।' তিনি এই গুরবত্বের একটি অন্যতম প্রকাশ হিসেবে দেশের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ম্যা□া, মেসো এবং মাই□া– এ তিনটি ধারা ও ধারণায় বিভাজন করেছেন। এ নিবন্ধে দেখিয়েছেন একটি জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এ দেশের মানুষ সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। এ কাজটির জন্য অন্যতম সহায়ক প্রতিষ্ঠান হলো স্থানীয় সরকার। পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশসমূহে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয়ভাবে শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সেবাসমূহের দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে একটি অন্যতম ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন 'সিটি গভর্নমেন্ট' নিজ এলাকায় উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিযোগিতা করে। তারা এমনভাবে তাদের নগরের অবকাঠামো, সেবা, সরবরাহ ও সুবিধাসমূহের পরিকল্পনা করে যাতে তারা একজন বিনিযোগকারীর দীর্ঘস্থায়ী মুনাফা অর্জনের সহায়ক হয় এবং বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি ও বিনিয়োগ ব্যয় কম হয়। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়গুলোর তেমন সচেতনতা বা কর্মউদ্যোগ চোখে পড়ে না। শুধু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা কাজের লাইসেন্স প্রদান করাই নয়, বরং তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার সহায়ক দায়িত্ব নিতে হবে। এ বোধ দ্বারা তাড়িত হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় অর্থনীতি দুটোই যুগপৎভাবে সমৃদ্ধ হবে। লেখক আলোচ্য প্রকাশনায় বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি, স্থানীয় সরকারের পৃথক বাজেট প্রণয়নের রূপরেখা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আইনি কাঠামো, নেতৃত্ব, অর্থায়ন, সমস্যা-সম্ভাবনা, নারীর ক্ষমতায়ন, নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে স্থানীয় উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রা□িয়ার জনঅংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও মাঠ প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পায় তেমনি গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। এ জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যথাযথ হওয়াও জরবরি। আমাদের দেশে বাজেটের বরাদ্দ প্রস্তাবগুলো মূলত আসে তিনটি প্রধানভাবে– ১) অনুন্নয়ন খাত মূলত. মন্ত্রণালয়ের নামের বিপরীতে মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্থাপন খরচ, ২) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ, ৩) উন্নয়ন বরাদ্দসমূহ আবার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট খাতের ছকে পুনর্বিন্যাস হয়ে আসে। বাজেটের এসব জটিলতাই গতানুগতিক এবং বৃত্তাবদ্ধতা। উপরন্তু আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে যেভাবে বাজেট ব্যয়ের চর্চা

লেখক : সোমা দত্ত, নাগরিক উদ্যোগ।

তাও কাঙ্ক্ষিত নয়। ইতিহাস থেকে দেখা যায় উপমহাদেশে বিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শুরব ব্রিটিশদের হাতে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কিছু তথ্য পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৫৫-৮৫ সাল এই ত্রিশ বছরের গড়পড়তা হিসেবে মোট সরকারি ব্যয়ের ৩০ শতাংশ এবং মোট জিডিপির ১৫ শতাংশ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয় হয়েছে। বাকি ব্যয় হয়ে থাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কিংবা সচিবালয়ের উন্নয়ন বরাদ্দ এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এসব উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদের তেমন কোনো সম্পৃক্ততা থাকে না বলেই চলে। ড. তোফায়েল আহমেদ স্থানীয় সরকার একটি পৃথক বাজেট প্রণয়নের দাবি তুলেছেন এবং একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন। যেসব সংগঠন স্থানীয় সরকারকে সরাসরি আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের জন্য কাজ করছেন তাদের জন্য নিঃসন্দেহে কার্যকর ও চিন্তাশীল একটি প্রকাশনা।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বিকেন্দ্রীকরণের বিকল্প নেই। একটি কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ নীতিমালা প্রণয়ণের দাবি দীর্ঘ সময়ের। এ দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। তারা নানা কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো অন্যতম মৌলিক অধিকার পূরণের ক্ষেত্রেও তাদের নানা ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তৃণমূলে যেসব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করছে সেখানেও নানা জটিলতা বিরাজমান। বিভিন্ন সরকারি দফতর, প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। অথচ জনগণের বিপুল অর্থ এসব সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নানা প্রয়োজন মেটানোর পেছনে ব্যয় হচ্ছে। শুধু সরকারি কর্মকর্তারাই নন আজকাল মফস্বলের রাজনৈতিক নেতারাও নিজ এলাকায় অবস্থান করেন না। এই যে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে তা নিরসনের জন্য একদিকে যেমন মাঠ প্রশাসনসহ সকল সরকারি দফতর ও প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতির ব্যাপারে প্রয়োজন কঠোর মনিটরিং– পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, প্রযুক্তির প্রসার এবং সর্বোপরি গ্রামাঞ্চল তথা মফস্বলে অধিক সরকারি বিনিয়োগ। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নসহ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ।

ইতিমধ্যে সরকার মাঠ প্রশাসনের বেশকিছু দফতরর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আশা করা যায় এর মাধ্যমে তাদের দায়িত্বশীলতা আরো বৃদ্ধি পাবে। বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারটি প্রবন্ধে বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসনের দুর্বলতা এবং সরকারের আকার-আয়তন সম্পর্কিত আলোচনায় অত্যন্ত সময়োপযোগী সংস্কার ধারণা স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ২০০৬ সালের ১/১১ পূর্ব সময়ের একটি চিত্রসহ সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানের বিগত নির্বাচনের তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ তিনটি দেশের মধ্যে দুটি দেশ সার্কভুক্ত। একটিতে দীর্ঘ সামরিক শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি বিদ্যমান। যদিও বর্তমানে বেসামরিক নেতৃত্ব ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। অন্যটি মাত্র ৭৬৫ কিলোমিটার আয়তনের ছোট একটি দ্বীপরাষ্ট্র। 'জন মজলিশ' (People's Majlish) এর সদস্য সংখ্যা ৫০- এর মধ্যে ৮ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। আবার বিশেষ মজলিশ যার সদস্য সংখ্যা ১১৩- এর মধ্যেও ২৯ জন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত। বিশেষ মজলিশে কোনো প্রস্তাব পাশ করতে হলে কমপক্ষে ৫৭ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়। এখানের ২৯ জনই যেহেতু প্রেসিডেন্টের মনোনীত, তাই বিরোধীদের পক্ষে এ মজলিশে শুধুমাত্র বিরোধিতা করা ছাড়া কোনো বিল পাশ করা বা সরকার আনীত বিলের কার্যকর বিরোধিতা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ রকম পরিস্থিতিতেও মালদ্বীপের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। ২০০৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৬ জন সরাসরি টেলিভিশন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনে মোহাম্মদ নাশিদ জয় লাভ করেন। ইতিমধ্যে তিনি একজন ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাতির কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশের ১৫-২০ হাজার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ মালদ্বীপের মৎস্য, কৃষি, সমুদ্র পরিবহন, হোটেল রেস্তোরাঁয় কাজ করছে। সম্প্রতি বিশ্ব উষ্ণায়ন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে এদেশটি বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা এবং ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশা আজ বিশ্ব নেতৃত্বের নজর কেড়েছে। বিরোধিতা ও রাজনৈতিক নৈরাজ্যের বদলে মালদ্বীপে বিদ্যমান সহবস্থানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে আমরা শিক্ষা নিতেই পারি।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বিকেন্দ্রীকরণের বিকল্প নেই। এ দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো অন্যতম মৌলিক অধিকার পূরণের ক্ষেত্রেও তাদের নানা ভোগান্তির শিকার হতে হয়। ইতিমধ্যে সরকার মাঠ প্রশাসনের বেশকিছু দফতর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর মাধ্যমে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের ৮টি রচনায় পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর মূল্যবান ও তথ্যবহুল আলোচনার সমাবেশ ঘটেছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের রচনাগুলোতে কিছু উন্নয়ন ধারণা অত্যন্ত অসানতনী ও সৃজনশীল। এছাড়া আফগান ও ইরাক যুদ্ধ- পরবর্তী বিশ্বে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়েও একটি বিশ্লেষণ ধর্মী রচনা রয়েছে প্রকাশনাটিতে।

উলেল্খ্য, ড. তোফায়েল আহমেদ অধুনালুপ্ত স্থানীয় সরকার কমিশনের সদস্য এবং একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ গবেষক ও লেখক। তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর বার্ড কুমিলল্লায় অনুষদ সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৯৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (বাংলাদেশ) তে স্থানীয় শাসন উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত। স্থানীয় সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে প্রায় ২০টি গ্রন্থ ও দেশি বিদেশি জার্নাল ও পত্রপত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ■

রক্ষাগোলা স্বনির্ভর খাদ্য নিরাপত্তা একটি বিকল্প ধারণা

সারওয়ার-ই-কামাল স্বপন*

সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ভলান্টারি অর্গানাইজেশন (সিসিবিভিও) স্থানীয় পর্যায়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি দশ বছর ধরে রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র ভূমিতে আদিবাসী জনজাতিসমূহকে 'রক্ষাগোলা ধারণা'র আলোকে তাদের স্বনির্ভর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। কাজের শুরুতে সিসিবিভিও প্রথমে নিজস্ব তহবিলে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা, ধারণাপত্র ও প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করে। পরে জুলাই ২০০৫ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহায়তা নিয়ে সিসিবিভিও গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নের ৫টি আদিবাসী গ্রামে (চৈতন্যপুর, নিমকুড়ি, কান্তপাশা-ঈদলপুর, শাহানাপাড়া ও পাথরঘাটা) একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। বর্তমানে এ প্রকল্পটি উলি-খিত উপজেলার দুটি ইউনিয়নের (দেওপাড়া ও গোগ্রাম) ২২টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই গ্রামগুলো হচ্ছে চৈতন্যপুর, নিমকুঁড়ি, শাহানাপাড়া, পাথরঘাটা, কান্তপাশা, বেলডাঙ্গা, গোলাই, জিওলমারী, গড় ডাইং, মলকী ডাইং, ডাইংপাড়া, নিমঘুটু, শ্রীরামপুর-বিড়ইল, বাগানপাড়া, গনকের ডাইং, ফারসাপাড়া, দাদৌড়, গুনিগ্রাম রাজাপাড়া, নরসিংগড় আদর্শগ্রাম, আগোলপুর, ঈদলপুর, মাধাইপুর,। এসব গ্রামে উঁরাও, সাঁওতাল, রাজুয়াড়, রায়, পাহাড়িয়া, শিং, হাজরা ও বাঙালি জাতির বসবাস। এর মধ্যে ২১টি আদিবাসী এবং ১টি বাঙালি গ্রাম। আদিবাসী গ্রামগুলোর প্রবীণদের মতে স্মরণাতীতকালে তাদের পূর্বপুরুষরা এই গ্রামগুলোতে বসতি স্থাপন করেছিল। বর্তমানে এখানে ৯৬৩টি পরিবারে ১৩৬২ নারী, ১৩১৯ পুরুষ, ৯৬২ মেয়েশিশু ও ৯৯৩ ছেলেশিশু, সর্বমোট ৪,৬৩৬ জন মানুষের বসবাস।

'রক্ষাগোলা' একটি জীবনমুখি ধারণা। এ ধারণাটি (Approch) সিসিবিভিও অর্জন করেছে বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমিতে বসবাসরত আদিবাসীদের অতি প্রচীন 'ধর্মগোলা' ধারণা থেকে। এখানে 'রক্ষা' অর্থ ঝুঁকি বা বিপদ থেকে বাঁচা এবং 'গোলা' অর্থ ভাণ্ডার বা কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান। 'রক্ষাগোলা' বলতে বোঝানো হয়েছে গ্রামীণ (Rural) জনসমাজের (Community) যে কোনো মৌলিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তাদেরই জীবনমুখি সমন্বিত কর্মসমষ্টির একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। রক্ষাগোলার মূল উপাদান চারটি ১) রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠন তৈরি ও শক্তিশালীকরণ, ২) রক্ষাগোলা খাদ্য ও অর্থ ভাণ্ডার তৈরি ও ব্যবহার, ৩) জাতিগত সংস্কৃতি অনুশীলন, ৪) স্থানীয় সম্পদ ও সরকারি পরিসেবা প্রতিষ্ঠানে অগিম্যতা। উপাদানগুলোর সবই মানব সমাজের সাথে সামনঞ্জস্যপূর্ণ, সহায়ক ও জীবনধর্মী বলে সহজেই বাস্তবায়িত হয়।

এর বাস্তবায়ন প্র□িয়া বিবেচনা করলে দেখা যায়, রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনের মাঝে এমন একটি স্বপ্নের বীজ রয়েছে যা দিয়ে জনগণকে প্রণোদিত করে এবং তারা সংগঠিত হয় তাদের জাতিগত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো ঠিক রেখে। এ সময় প্রতিটি গ্রাম সমাজ সংগঠনের বিভিন্ন কার্য□ম পরিচালনার জন্য ৭ থেকে ১৩ নারী-পুরুষের সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটিও গঠিত হয়। অবশ্য এ কমিটির মধ্যে প্রচলিত সামাজিক নেতৃবৃন্দ (মোড়ল, প্রধান, মাঞ্জীহাড়াম প্রমুখ) পদাধিকারবলে যুক্ত হয়ে থাকেন। এ কমিটির কাজ হলো রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাওয়া এবং এ জন্য গ্রামবাসী সকলে মিলে রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনের একটি পরিচালনা নীতিমালা তৈরি করে। গ্রাম সংগঠনের সকল কাজে সহযোগিতা করার জন্য গ্রামের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ নিজেদের গ্রাম থেকেই মনোনীত করেন এক জন করে গ্রাম সংগঠক বা স্বেচ্ছাসেবীকে। এই গ্রাম সংগঠক বা স্বেচ্ছাসেবীটি অবশ্যই কিছুটা অক্ষরিক ও হিসাব সংরক্ষণের জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে থাকে।

এরপর গ্রামভিত্তিক সংগঠনের সিদ্ধান্ত□মে শুরু হয় খাদ্য সঞ্চয় ও খাদ্য সহায়তা লেনদেনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং আর্থিক কার্য□ম। সমাজ সংগঠনের সকল সদস্য পরিবার সপ্তাহে কমপক্ষে অর্ধ কেজি মুষ্টি চাল এবং প্রতিটি শস্য মৌসুমে ৫ কেজি মৌসুমি ধান সঞ্চয় শুরু করে। খাদ্য সঞ্চয় বেড়ে গেলে গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি করে তাদের রক্ষাগোলা খাদ্য ভাণ্ডারসহ সমাজ গৃহটি। এ কাজে সমাজ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ছোট দলে ভাগ হয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ঘরের মাটির দেয়াল তৈরি করে। সাধারণত দুই-তিন

* সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান, সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন

মাসের মধ্যে দেয়ালের কাজ শেষ হয়। সিসিবিভিও তাদের টিনের ছাউনি দিতে সহায়তা করে। এছাড়া গ্রামের প্রতিটি পরিবারের মূল খাদ্য চাহিদা (অর্থাৎ চাল-ধান) ঠিক রেখে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বা যেসব খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেগুলো স্থানীয় বাজারে বি□ করে দেয় এবং এই টাকা গ্রাম সংগঠনের ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। ফলে গড়ে ওঠে সামাজিক পুঁজি। গ্রাম সমাজ সংগঠন এই মূলধন স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে থাকে। এই পুঁজি সংগঠন প্রয়োজনবোধে গ্রামবাসীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তাদান অথবা সংগঠনের আয় বৃদ্ধিমূলক কোনো প্রকল্পে ব্যবহার করে। যে সংগঠনগুলো একটু এগিয়ে গেছে তারা এই সামাজিক তহবিল ব্যবহার করে আয়বর্ধক কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

ফলে এখন সংগঠিত গ্রামগুলোতে সেসব সমস্যা নেই যা, গ্রামবাসীদের বছরে প্রায় ৬ মাস চরম খাদ্য দারিদ্র্যে রাখত এবং ঐ সময় তারা দ্বিগুণ হারে সুদ দিয়ে গ্রাম্য মহাজন কিংবা এনজিও'র কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হতো। এমনকি ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে সম্পদ বি□ করে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আর যারা প্রায় সম্পদহীন তারা ঋণ পরিশোধের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতো; চরম কলহ-বিবাদ ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার ফলে সংগঠিত গ্রামগুলোতে সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, পূঁজা-আর্চা, বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিবস পালনের চর্চা ফিরে আসে। আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতির সংরক্ষণে গড়ে ওঠে রক্ষাগোলা সাংস্কৃতিক দল।

গ্রাম সমাজ সংগঠনগুলো স্থানীয় সম্পদ ও সরকারি পরিসেবা এবং আদিবাসীদের লোকজ জ্ঞান-দক্ষতাকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে ব্যবহার বৃদ্ধিতে প্রচারমূলক কার্য□ম গ্রহণ করে। ফলে স্থানীয় সম্পদ ও সরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায়। সম্পদ এবং সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের মালিকানা এবং নারী-পুরুষের যৌথ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।

গ্রামভিত্তিক রক্ষাগোলা খাদ্য ভাণ্ডার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামের সকল পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং গ্রাম সমাজ সংগঠনের নিজস্ব পুঁজি গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৬টি রক্ষাগোলা খাদ্য ভাণ্ডারসহ সমাজ গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় সদস্যরা ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫ থেকে মে ২০১১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১,৭৬,৯৪২ কেজি চাল, ৪৪,৭০৮ কেজি ধান এবং ২১,০২,৪০৫ টাকা সঞ্চয় করেছে। এই সঞ্চয় থেকে সংগঠনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৯৯,১৮৮.৫ কেজি চাল, ৫৪,০৪৮.৫ কেজি ধান এবং ৩,৩৩,৭৩৫ টাকা সহায়তা দান করেছে। খাদ্য সহায়তা গ্রহণ করেছে ২,২৩১টি পরিবার, চিকিৎসা সহায়তা গ্রহণ করেছে ২৪৬টি পরিবার, শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ করেছে ২৪টি পরিবার, ভূমি বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ করেছে ৫৬টি পরিবার। এছাড়া আরো ৫৬২টি পরিবার বসত ভিটায় সবজি চাষ করে নিজেদের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করছে। এর প্রভাব পড়েছে কার্য□ম পরিচালিত এলাকার বাইরের আরো ১৫টি আদিবাসী গ্রামের জনগণের ওপর। ফলে ওইসব গ্রামের জনগণ নিজ উদ্যোগে রক্ষাগোলা গ্রাম সংগঠন গড়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। ■

শাহানাপাড়া আদিবাসী রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনটি স্বনির্ভরতার দিকে এগোচ্ছে

শাহানাপাড়া গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিয়নে অবস্থিত প্রায় দুই শতাধিক বছরের পুরানো একটি আদিবাসী গ্রাম। ২০০৫ সালে এ গ্রামে গড়ে ওঠে আদিবাসী রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠন। এরপর থেকে গ্রামবাসীরা তাদের সাপ্তাহিক মুষ্টি চাল ও মৌসুমি ধান সঞ্চয় শুরু করে। শাহানাপাড়ার সংগঠন তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা সংগঠনের সদস্য পরিবারের মধ্যে লেনদেনের পরও অনেক খাদ্যশস্য সংরক্ষণের সময়সীমা অতি□ম করে অবশিষ্ট থেকে যায়। অতিরিক্ত এই খাদ্যশস্য বি□র টাকা সংগঠনের ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় শুরু করে। এভাবে ধীরে ধীরে সঞ্চিত সামাজিক পুঁজির পরিমাণ ২০১০ সালে দাঁড়ায় এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা।

তাদের এই সঞ্চিত মূলধন কাজে লাগিয়ে সংগঠনকে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিতে সংগঠনের পরিচালনা কমিটি ও গ্রাম সমাজের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা সাড়ে ১১ বিঘা জমি দুই বছরের জন্য লিজ নেয়। একই বছরে তারা ৯.৫ বিঘা জমিতে দুবার ধান এবং ২ বিঘা জমিতে একবার টমেটো চাষ করে। ইতিমধ্যেই শাহানাপাড়া আদিবাসী রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনটি ৬,৯৬০ কেজি (১৭৪ মণ) ধান উৎপাদন করছে। এই ধান তারা স্থানীয় বাজারে বি□ করে এক লাখ তেইশ হাজার সাতশ ষাট টাকা পেয়েছে। এছাড়া গ্রামের জনগণের সবজির চাহিদা মেটানোর পরও তারা তেরো হাজার টাকার টমেটো বি□ করেছে।

শাহানাপাড়া সংগঠনের এই কৃষি প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে সতেরো হাজার একশ তেপান্ন টাকা, প্রকল্পে ব্যয় বাদ দিয়ে প্রকৃত আয় হয়েছে এক লাখ উনিশ হাজার ছয়শ সাত টাকা।

এর ফলে শাহানাপাড়া রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনটির স্বনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে অপরাপর আদিবাসী রক্ষাগোলা গ্রাম সমাজ সংগঠনগুলোর কাছে এটি একটি স্বনির্ভরতার উদাহরণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। ■

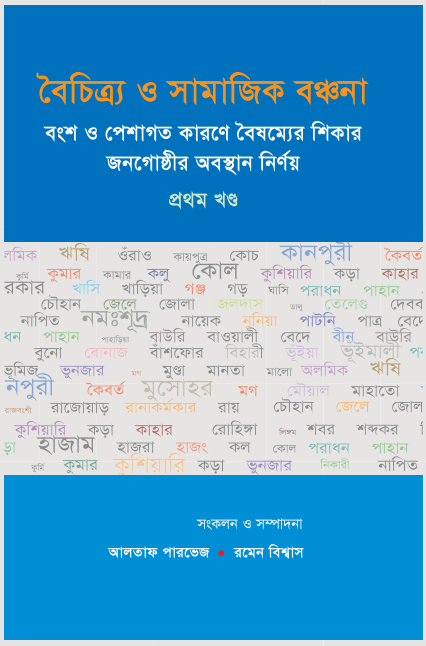

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি থাকলেও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এখনো নানান বৈষম্যের শিকার। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত হলো দলিত জনগোষ্ঠী। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা, সুযোগ ও সম্পত্তিতে অধিকারহীনতার কারণে নিজেদের অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) প্রথমবারের মতো এসব বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কাজে নাগরিক উদ্যোগ সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে। বিডিইআরএম 'বৈচিত্র্য ও সামাজিক বঞ্চনা' শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশনায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কিংবা বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত দলিতদের ৫৭টি জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংকলন ও সম্পাদনা : আলতাফ পারভেজ ও রমেন বিশ্বাস

প্রকাশক : বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) এবং নাগরিক উদ্যোগ

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১০

মূল্য : ১০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-1622-6

'প্রতিবন্ধিত্ব প্রেক্ষিত মানবাধিকার ও সেবার মান উন্নয়ন'– এটি একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। উক্ত প্রকাশনাটিতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বৈশ্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং পাশাপাশি প্রতিবন্ধিত্বের কারণ নির্ণয়, দেশীয় অবস্থান থেকে তাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, তাদের প্রতি পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গিও ফুটে উঠেছে। গবেষণা কাজে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জরিপ পদ্ধতি এবং কেইসস্টাডির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সন্নিবেশ হয়েছে। এছাড়া সংযোজিত হয়েছে বাংলায় প্রকাশিত জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি-বিধান'। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন বা কাজের আগ্রহ আছে এমন প্রতিষ্ঠান এবং একাডেমিশিয়ানদের জন্য এটি একটি সহায়ক প্রকাশনা।

গবেষক : জাকির হোসেন ও ড. আলতাফ হোসেন

প্রকাশক : নাগরিক উদ্যোগ

প্রকাশকাল : জুন ২০১০

মূল্য : ১৫০ টাকা

ISBN : 978-984-33-2058-2

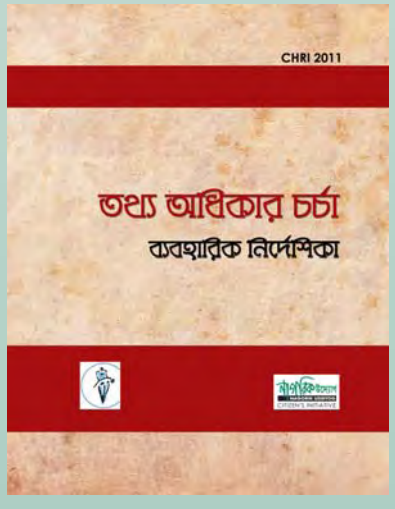

তথ্য অধিকার চর্চা : ব্যবহারিক নির্দেশিকা

এ বইটিতে তথ্য অধিকার আইনের প্রধান ধারাসমূহ, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, তথ্য কমিশনসহ তথ্য অধিকার আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কী ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে, কী কী তথ্য সরকার দিতে বাধ্য নয় এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ইতিবাচক উদাহরণসহ বিভিন্ন বিষয় কেইসস্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে যা সকল স্তরের জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে। বইটির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির মৌলিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ তথ্যের জন্য অনুরোধ, আপিল ও অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নমুনাসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করছি, এ পুস্তকটি তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সকল নাগরিকের তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্যে করবে।

গ্রন্থনা, বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা : মাজহারুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম ও অমিত রঞ্জন দে

প্রকাশক : নাগরিক উদ্যোগ ও কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ

প্রকাশকাল : ২০১১

মূল্য : ২০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-3305-6